KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : মাঘ, ১৩৬৪ ফাল্গুন, ১৩৬৪ চৈত্র, ১৩৬৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No.: KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 (0.50) SAMAKALIN

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

= সম্পাদক =

= সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর = আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

পঞ্চম বর্ষ ফাল্গুন ১৩৬৪

সামান্য একটু সৌজন্য

শীতের রাতে ট্রেনের
কামরায় জোয়ান মানুষ
সারা বেঞ্চি জুড়ে কম্বল মুড়ি
দিয়ে শুয়ে আছে···
পাশেই হয়ত বাচ্চা এক ছেলে
মালপত্রের ওপর ঠায়
বসে' শীতে
কাঁপছে···এক কোণে ভীড়ের
চাপে কোন মহিলা
হয়ত কষ্ট পাচ্ছেন···বুড়ো
অথর্বদের ফিরে
দেখছেই না কেউ···ট্রেনের
কামরায় এই ধরনের
অপ্রীতিকর দৃশ্য
হামেশাই চোখে পড়ে।
অথচ সহযাত্রীদের
সামান্য একটু
সৌজন্যে সকলের
পক্ষেই ট্রেন-ভ্রমণ প্রীতিকর
হ'য়ে উঠতে পারে।
মিষ্টি কথা আর আন্তরিক
ব্যবহারে পথের অনেক
কষ্ট অনেক অসুবিধাই
হাসি মুখে সহ্য করা যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

ER/PA/6

সমকালীন

পঞ্চম বর্ষ। ফাল্গুন। ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ বাংলা কলাপ্রসারণ-মাত্রিক ছন্দ। নীলরতন সেন ৬৬১
কালিদাসের কাব্যে ফুল। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৬৯
গ্যেটে ও শিলের। শ্যামাদাস সেনগুপ্ত ৬৮৪
অ নু স্ম তি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৬৭৮
গ ল্প ॥ চাবি। রবীন্দ্র সেনগুপ্ত ৬৯১
উ প ন্যা স॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯৬
আ লো চ না ॥ স্বদেশের কুকুর ধরিব। সোমেন বসু ৭০২
পূর্বাঞ্চলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকা প্রসঙ্গে। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৭০৫
স মা জ স ম স্যা ॥ বিলাসিতা প্রসঙ্গে। সুব্রতেশ ঘোষ ৭০৬

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

★ A R U N A ★

★ A R U N A ★

পঞ্চম বর্ষ সমকালীন ফাল্গুন ১৩৬৪

বাংলা কলাপ্রসারণ-মাত্রিক ছন্দ

নীলরতন সেন

বাংলা ছন্দের মূল তিনটি প্রকৃতির কথা প্রায় সমস্ত ছান্দসিকই স্বীকার করেছেন। তবে এই ছন্দপ্রকৃতির নীতি নির্ধারণে সকলে একমত হতে পারেন নি। অনেকেই এটি উপলব্ধি করেছেন যে 'দল' syllable-এর (অনেকে syllable-এর পরিভাষা 'অক্ষর' রেখেছেন) উচ্চারণ তারতম্যের ওপরেই ছন্দের উচ্চারণ প্রকৃতির পার্থক্য ঘটে। তিনটি ছন্দ প্রকৃতির নাম দেওয়া যেতে পারে, (।) কলা-মাত্রিক[২] (।।) কলা-দল মাত্রিক এবং (।।।) কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দ। কলামাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পর্বে 'কলা' বা mora-কে অর্থাৎ একটি হ্রস্বস্বরের স্বাভাবিক উচ্চারণ সময়কে এক'মাত্রা'র মর্যাদা দেওয়া হয়। এবং সেই তুলনাত্মক মাপে একটি 'রুদ্ধদল' বা closed-syllable-কে দুই মাত্রার এবং 'মুক্তদল' বা open syllable-কে একমাত্রার সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হয়। 'কলা মাত্রিক' ছন্দকে অনেক ছান্দসিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলেন। 'কলা-দল মাত্রিক' ছন্দে প্রত্যেক মুক্তদলকে এবং শব্দ-মধ্য রুদ্ধদলকে একমাত্রা সময়ে এবং সে তুলনায় শব্দ শেষের রুদ্ধ-দলকে দুমাত্রা সময়ে উচ্চারণ করা হয়; এটিই বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক পদ্ধতি।—আমাদের ধারণায় এ ছন্দ প্রকৃতির মাত্রা বা Unit কলামাত্রিক ছন্দের মাত্রা-মাপ থেকে কিছু পৃথক। কলা এবং রুদ্ধদল—উভয়কে একমাত্রা মাপে উচ্চারণ করার ফলে এর মাত্রার প্রকৃতিগুণে কিছুটা বেশী গাম্ভীর্য এসে পড়ে, কলা এবং দলের সমন্বয়ে এ ছন্দের মাত্রা মাপ গড়ে উঠেছে বলেই একে আমরা 'কলা-দল-মাত্রিক' ছন্দ নাম দিতে চাইছি। বিভিন্ন ছান্দসিক এই ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত, যৌগিক বা তানপ্রধান ছন্দ বলেছেন—এ ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'আট, ছয়, বা দশমাত্রার পদযতির (Calsuric-Pause) প্রাধান্য।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, বাংলা কলা-প্রসারণ-মাত্রিক ছন্দের উচ্চারণ প্রকৃতি। এ ছন্দের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের মতবাদ পেশ করবার পূর্বে প্রচলিত প্রখ্যাত কয়েকজন ছান্দসিকের মতবাদের বিচার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ছান্দসিক-এ ছন্দকে দল মাত্রিক, স্বরবৃত্ত, বলবৃত্ত, ছড়ার ছন্দ, প্রাকৃত ছন্দ, লৌকিক ছন্দ, শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। তবে আলোচ্য ছন্দের মাত্রা গণনা পদ্ধতিতে—ছান্দসিকরা একমত হতে পারেন নি।

একটি মতবাদে বলা হয়েছে, "শ্বাসাঘাতই এ ধরণের ছন্দে প্রধান তথ্য।...শ্বাসাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর করে। বাংলায় মাত্রাপদ্ধতি বাধা ধরা বা পূর্বনির্দিষ্ট নহে; বাঁধা নিয়মে মাত্রার হিসাব করা চলিতে পারে না।[১]—এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল, কবিতার পর্ব (foot) বা পদের (Calsuric-Section) সুনির্দিষ্ট মাত্রা মাপের ওপরেই ছন্দের ধ্বনি সৌন্দর্য—নির্ভরশীল। কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পূর্ণপর্বের মাত্রা সমকত্ব না থাকলে চলে না।—কোনও পর্বে মাত্রা সংখ্যা চার, কোথাও পাঁচ, কোথাও সাত এমন ভাবে পর্বের মাত্রা বিন্যাসে গদ্য কবিতা হয়তো বা রচিত হতে পারে,—ছন্দ তাল সমন্বিত কাব্যের ধ্বনি সুষমা তাতে ফুটবেনা।

হোম্ আরতি ঘিয়ের বাতি তপ্‌তপস্যা আড়ম্বর।
জপ্‌ব না নাম্ ন্যাস্ প্রাণায়াম্ করবো নাকো অতঃপর॥

এ কবিতায়, পংক্তিশেষের ভগ্নপর্ব ছাড়া, প্রত্যেকটি পর্বের উচ্চারণগত সময়ের মাপ সমান। ছান্দসিক তা অস্বীকার করতে চাইলে শ্রুতিবোধকেই অবমাননা করা হবে। 'ছন্দ সরস্বতী' সত্যেন্দ্রনাথ কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দের রুন্ধদলকে ১½ মাত্রা এবং মুক্তদলকে একমাত্রা হিসেবে গণনা করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সে পদ্ধতি ঠিক নয়। আলোচ্য কাব্য উদাহরণটিতে প্রথম পর্ব 'হোম্ আরতি'—এর রুন্ধদল 'হোম্' = ১½ মাত্রা, মুক্তদল 'আ', 'র' এবং 'তি' = ৩ মাত্রা—মোট ৪½ মাত্রা। কিন্তু 'জপ্‌ব না নাম্' পর্বটিতে দেখি তাঁর হিসেব মতো রুন্ধদল 'জপ্', 'নাম' = ১½+১½ বা ৩ মাত্রা এবং মুক্তদল 'ব', 'না'=১+১ বা ২ মাত্রা—মোট পাঁচ মাত্রা। তাহলে একটি ৪½ মাত্রা, অপরটিতে ৫ মাত্রা হচ্ছে। আমাদের কানই সাক্ষাদেবে, এ গণনা ভুল হচ্ছে। দুটি পর্বেরই উচ্চারণ সময়ের ওজন একই। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ এ ছন্দের মাত্রা গণনা পদ্ধতির সঠিক পরিচয় দিতে পারেন নি বলতে হচ্ছে।

একটি মতবাদে বলা হয়েছে, "যে পদাচ্ছন্দে (১) দীর্ঘ মূলপর্ব স্বরান্ত এবং হলন্ত উভয়-বিধ অক্ষর মিশ্রণে গঠিত, এবং (২) এই পর্ব হইতেছে চতুরক্ষর, অনুমান করিতে হইবে যে ঐ ছন্দের কেবল স্বরান্ত অক্ষরে রচিত পর্ব বা কেবল হলন্ত অক্ষরে রচিত পর্ব সাধারণ পর্ব নহে,—বিশেষ পর্ব, এবং ওই ছন্দ হইতেছে বলবত্ত জাতীয়। ইহা প্রবল ভঙ্গীতে উচ্চার্য। উচ্চারিত অবস্থায় ইহার পর্বদৈর্ঘ্য সাড়ে চারি মাত্রা।৩—ছান্দসিক 'বলবত্ত' বলতে কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দকে বুঝিয়েছেন। 'দল'কে অক্ষর বলেছেন এবং মুক্তদলকে স্বরান্ত অক্ষর, রুন্ধদলকে হলন্ত অক্ষর বলেছেন।—এই সংজ্ঞা নির্ণয়ে ছান্দসিক প্রত্যেক পর্বের প্রথমে ½ মাত্রা রেখে বাকী চারটি দলকে এক এক মাত্রা ধরেছেন। সেখানে প্রশ্ন হল, তিনটি রুন্ধদলে বা একটি মুক্ত—দুটি রুন্ধদলে গঠিত বিশেষ পর্বে তিনি কি ভাবে মাত্রা ভাগ করবেন?

হাত্ ঝুম্ ঝুম্ পা ঝুম্ ঝুম্ সীতারামের খেলা

'হাত্ ঝুম্ ঝুম্' (তিনটি রুন্ধদল পর্ব) বা 'পা ঝুম্ ঝুম্' (একটি মুক্ত+দুটি রুন্ধদল পর্ব)—পর্বদুটিতে তাঁর হিসেবে ৩½ মাত্রা হয়ে যাচ্ছে। তারপর আর একটি প্রশ্ন, যদি প্রত্যেক দলে (রুন্ধ মুক্ত নির্বিশেষে) একমাত্রাই হয় তবে কেন কোনও পর্বে চারটি রুন্ধদলের স্থান সঙ্কুলান

১... 'কলামাত্রিক' নামকরণটি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-এর 'ছন্দ-পরিভাষা' থেকে গ্রহণ করেছি। 'দল' কলা ইত্যাদি পরিভাষাগুলিও উপরোক্ত পরিভাষা-পুস্তিকা থেকে গ্রহণ করেছি।

২... দ্রঃ বাংলাছন্দের মূলসূত্র, পৃষ্ঠা ১০১ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

৩... দ্রঃ ছন্দোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ১০১, (১ম সংস্করণ)—শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য।

হয়না,—এমনকি তিনটি রুন্ধ একটি মুক্তদল বিন্যাসেও পর্বের মাত্রা ওজন ভারী হয়ে ওঠে?—ছান্দসিকের হিসেব মতো এগুলি তো ৩½ মাত্রাই হওয়া উচিত।

অনেক বাক্য হানাহানি **গর্জন বর্ষণ** অনেকখানি

এখানে অন্যান্য পর্বগুলির সাথে চারটি রুন্ধদলে গঠিত 'গর্জন বর্ষণ' পর্বটি পড়তে গেলে ছন্দের সমতা রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি

রোগের ক্ষণের শেষ রাখনা **কলঙ্কের শেষ** রাখবে কি?

এই কাব্যপংক্তিতে তিনটি রুন্ধ+একটি মুক্ত দল—পর্ব 'কলঙ্কের শেষ'—অন্যান্য পর্বের তুলনায় মাত্রা ওজনে ভারী হয়ে উঠেছে।—এর থেকেই অনুমান করা যায় ছান্দসিকের মাত্রাগণনা রীতিতে ত্রুটি রয়ে গেছে। তিনি পর্ব প্রথমের ঝোঁকের জন্যে ½ মাত্রা বেশী রাখতে চেয়েছেন সেখানেও আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দ ছাড়া অনাপ্রকৃতির ছন্দে কি পর্ব-প্রথমের ঝোঁক আসতে পারে না? যেমন—

'টুপ্ টুপ্ 'ওই ডুব্ 'দেয় পান- 'কৌড়ি[৪]

অথবা

'ভাস্‌ছে 'বিলখান 'ভাস্‌ছে 'বিলকুল!
'ঝাপ্‌টা 'ঝাপ্‌টায় 'হাস্‌ছে 'জুঁইফুল!

এ কবিতায়ও পর্ব প্রথমে ঝোঁক পড়েছে। ছান্দসিক এগুলিকে 'শ্বাসবেশী' 'বলবত্তগন্ধী' মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ বলেছেন। আমরা বলি ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ উচ্চারণের একটি ভঙ্গি বিশেষ, তাকে মূল একটি ছন্দ প্রকৃতি রূপে গণ্যকরা ঠিক নয়। কলা মাত্রিক বা কলা-প্রসারণ মাত্রিক—উভয় ছন্দ প্রকৃতিতেই রুন্ধদলের সংখ্যা বাড়িয়ে এই ঝোঁক আনা সম্ভব।

কয়েকজন ছান্দসিক 'যুগ্মধ্বনিকে সচরাচর সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে, কিনা ঠেশে উচ্চারণ করে ধরা হয় একমাত্রা" ৫—মতবাদের সমর্থনে এ ছন্দ প্রকৃতির প্রতি পর্বের মাপ চতুর্দল (tetra-syllabic)—চতুর্মাত্রিক (tetra-moric) ধরেছেন।—এ মতবাদ সম্পর্কেও আমাদের একই প্রশ্ন রয়ে গেছে। চতুর্দল এ ছন্দের সাধারণ পর্বমাপ ধরলেও (দ্বিদল পর্বও হতে পারে আমরা দেখিয়েছি)—চতুর্মাত্রিক বলা চলছেনা।—কারণ সেক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই প্রত্যেক পর্বে চারটি রুন্ধদলের স্থান হওয়া উচিতছিল,—কিন্তু চারটি রুন্ধদল কেন, তিনটি রুন্ধ+একটি মুক্তদল পর্বও এ ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা করে।—সে উদাহরণ আগেই তুলেছি আমরা।

এবারে রবীন্দ্রনাথের এ ছন্দ-প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি মূল্যবান মন্তব্য তুলছি আমরা।—তাঁর মন্তব্যের আলোকে দেখলে হয়তো এ ছন্দ-রহস্যের সূত্র মিলতে পারে। তিনি একটি ছড়াকে উর্ধপর্বভাগে (Sub-foot) সাজিয়ে মন্তব্য করেছেন,

"বৃষ্‌টি। পড়ে-। টাপুর্‌। টুপুর্‌। নদেয়। এলো-। বান্‌।
শিবঠা। কুরের্‌। বিয়েয়। হবে-। তিন্‌ক। ন্‌না-। দা-ন্‌।

"দেখা যাচ্ছে, তিন গণনার যেখানে যেখানে ফাঁক, পাশবর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে।...যারা অক্ষর (letter) গণনা করে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে **স্বরবর্ণে টান দিয়ে মাঁড় দেবার জন্যেই** প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ—সেসব জায়গায় ধ্বনির

৪... '/' চিহ্ন দিয়ে পর্ব প্রথমের ঝোঁক বোঝানো হল।

৫... দ্রঃ ছান্দসিকী, পৃঃ ২০, (১ম সংস্করণ)—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

রেশ কিছুটা কাজ করবার অবকাশ পায়" ৬

সম্ভবতঃ এছন্দের, রবীন্দ্রভাষায় "স্বরবর্ণে টানদিয়ে মাঁড় দেবার প্রয়োজনীয়তা বুঝেই জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ ছান্দসিক এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন, "চার সিলেব্‌ল্‌কে ভিত্তি করে ছয়মাত্রার ব্যবস্থা করলেই এ ছন্দের স্বরূপ পাওয়া যায়।" ৭

এবারে আর একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে তারপর আমাদের বক্তব্য পেশ করব।—"প্রবোধবাবুর মতে, 'এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পংক্তিতে চারপর্ব (চতুর্থটি অপূর্ণ), প্রতিপর্বে চারধ্বনি, এবং প্রথম ধ্বনিতে প্রস্বর থাকে।'—আমি মনে করি বাংলায় accent থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর। সাধারণতঃ গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়।... প্রতি পর্বে চারধ্বনি (syllable) তা স্বীকার করি। কিন্তু ব্যতিক্রমও হয়। এই রকম ছড়া-জাতীয় বা লৌকিক ছন্দের একটি লক্ষণ—শেষ পর্বছাড়া প্রতি পর্বে ছমাত্রা। কিন্তু অন্য শ্রেণীর ছন্দেও ছমাত্রা হতে পারে। অতএব এ ছন্দের বিশেষ লক্ষণ আর কিছু। এই লক্ষণ—মাত্রাপূরণের জন্য স্থানে স্থানে মুক্তধ্বনিকে টেনে গুরু করা।...এই রকম মাত্রাপ্রসার হয় বলেই এই শ্রেণীকে প্রসারক বলতে চাই।" ৮ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এই সাহিত্যিক কলা-মাত্রিক ছন্দকে 'স্থিরমাত্র', কলা-দল মাত্রিক ছন্দকে 'অস্থির-সঙ্কোচক মাত্র' এবং 'কলা প্রসারণ মাত্রিক' ছন্দকে 'অস্থির-প্রসারক মাত্র' ছন্দ নাম দিয়েছেন।— এ নামকরণে সবচেয়ে মুস্কিল হল, মাত্রার অর্থ হচ্ছে unit-measure. এই unit মাপ করে সঙ্গে বাঁধা হল সেটা অনন্ত থেকে যায়। এবং আমাদের বিবেচনায় তিনছন্দ প্রকৃতিতেই মাত্রা বা unit-measure গুণগত বিচারে কিছুটা পৃথক হতে বাধ্য। সেই unit-measure কখন কাকে করা হচ্ছে সেটার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি।

এবারে আলোচ্য ছন্দ প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'স্বরবর্ণে টান দিয়ে মাঁড় দেবার' যে কথা বলেছেন এ ছন্দের সেটিই বিশিষ্ট গুণ বলা যেতে পারে। লঘু স্বরধ্বনি বা 'কলা'র এক মাত্রিক ব্যবহার রীতি বাংলায় মুক্তদলগুলিতেও সংক্রামিত হয়েছে। সুতরাং বাংলায় মুক্তদল মাত্রেই 'কলা'-প্রকৃতির ধ্বনি গুণসম্পন্ন।—এই কলা মাপকে টেনে স্থিমাত্র বা কদাচিৎ ত্রিমাত্র করলে এবং সেই সাথে রুদ্ধদলের কিছু বেশী প্রয়োগ করলে, কাব্যের ছন্দে 'সংগীত মাঁড়ের' একটা উন্মেল স্পন্দন সৃষ্টি করা যায়। দেশীয় সংগীতে এই ধ্বনি-প্রধান তালের উন্মেলতা ছড়াগুলির সৃষ্টিকাল থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এ ছন্দের সর্বপ্রধান কথা হল, একাধারে রুদ্ধদলের প্রাধান্য এবং মুক্তদলের মাত্রা সম্প্রসারণ সুযোগ রাখতে হবে। অবশ্য মাঝে মাঝে দুএকটি পর্বে মুক্তদল (বা কলার) প্রসারণ সুযোগ না দিলে ক্ষতি নেই—কিন্তু সে পর্ব-গুলিতে রুদ্ধদলের প্রাধান্য রাখা দরকার। আবার মাঝে মাঝে দুএকটি পর্বে রুদ্ধদল বর্জন করে নিছক মুক্তদলের মাত্রা-প্রসারণ সুযোগটুকু রাখলেও চলে,—তবে যাতে সমগ্র পংক্তিতে এই উভয় বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হয় তা দেখতে হবে।

এ ছন্দ সম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল, পর্বগুলি ষট্‌মাত্রিক হবে। —পূর্ণ পর্ব চতুর্মাত্রিক, ত্রিমাত্রিক বা পঞ্চমাত্রিক হলে—একাধারে রুদ্ধদল এবং প্রসারিত মুক্তদল ব্যবহার সম্ভব হয় না—এবং তার ফলে পর্বজোঁক আনা গেলেও এই 'মাঁড় টানের' উন্মেলতা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়না। সপ্তমাত্রিক পর্বেও এ ছন্দের চলচপল লঘু-পদক্ষেপ বাহত হয়। যদি

৬... দ্রঃ ছন্দ, পৃষ্ঠা ১৩৩-৩৪ (১ম সংস্করণ)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭... দ্রঃ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৯২ (১ম সংস্করণ)—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।

৮... দ্রঃ পরিচয় জয়ন্তী সংকলন পৃঃ ২৮৭-৮৮—"বাংলা ছন্দের শ্রেণী"—শ্রীরাজশেখর বসু।

আদর্শ পর্বমাপের কথা বলতে হয়—তবে তিনটি মুক্ত+একটি রুদ্ধদল নিয়ে চতুর্দল ছন্দের আদর্শ মাপ বলা পর্বই এ উচিত। —এতে দুটি মুক্তদলের একমাত্রা করে দুমাত্রা, একটি মুক্ত-দলের প্রসারণে দুমাত্রা এবং একটি রুদ্ধদলের দুমাত্রা,—মোট ছমাত্রা থাকে। তাছাড়াও এ ছন্দের পর্ব গঠনে নানা বিচিত্ররকমের দলসমাবেশ হতে পারে; যেমন—

মেঘের উপরে(।) মেঘ করেছে(।।) রঙের উপর রঙ॥
মন্দিরেতে কাসর ঘণ্টা বাজল ঢঙ(।।।) ঢঙ॥

এখানে (।) 'মেঘের উপর' পর্বটিতে দুটি মুক্তদল ('মে' এবং 'উ'=২ মাত্রা) এবং দুটি রুদ্ধদল ('ঘের্' এবং পর্=২+২) রয়েছে। এখানে রুদ্ধদলের দোলা আছে, মুক্তদলের প্রসারণ টান নেই। মুক্তদল দুটি একমাত্রিক, রুদ্ধদল দুটি স্থিমাত্রিক, মোট পর্বমাপ ছমাত্রা। (।।) 'মেঘ করেছে' পর্বটিতে তিনটি মুক্তদল ('ক' 'রে' এবং 'ছে'=৪ মাত্রা) এবং একটি রুদ্ধদল (মেঘ্‌=২ মাত্রা)। রুদ্ধদল স্থিমাত্রিক, একটি মুক্তদলও ('ছে') স্থিমাত্রিক। বাকী মুক্তদল দুটি এক-মাত্রিক। মোট পর্বমাপ ছমাত্রা। এ পর্বে রুদ্ধদলের দোলা এবং মুক্তদলের প্রসারণটান দুই-ই রয়েছে। এটি কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দের আদর্শ পর্ব। (।।।) 'বাজল ঢঙ্‌' পর্বটিতে একটি মুক্তদল (ল=২ মাত্রা) এবং দুটি রুদ্ধদল (বাজ্‌ এবং ঢঙ্‌=৪ মাত্রা)। তিনটি দলই স্থিমাত্রিক। লক্ষ্য করবার বিষয়, (।) এবং (।।) পর্বদুটি চতুর্দল—ষট্‌মাত্রিক। কিন্তু (।।।) পর্বটি ত্রিদল ষট্‌মাত্রিক।—তবে এ পর্বেও রুদ্ধদলের দোলা এবং মুক্তদলের প্রসারণটান—দুই-ই রয়েছে। পর্বদল যে আরও কত বিচিত্র সমাবেশে বসতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ তোলা যাক্‌।

বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌(ক) ঝুপ্‌।
দস্যি ছেলে গল্প শোনো একেবারে(খ) চুপ্‌।

এখানে (ক) 'ঝুপ্‌ ঝুপ্‌' পর্বটি মাত্র দুটি রুদ্ধ দল নিয়ে গঠিত।—দলদুটি ত্রিমাত্রিক। রেশ টেনে উচ্চারণ করে অন্য পর্বের সঙ্গে ছয়মাত্রার সমতা রাখতে রাখতে হয়।—এটি প্রসারক রুদ্ধ-দলের স্বিকল দলের ত্রিমাত্রা প্রসারণের উদাহরণ। বলা বাহুল্য প্রাচীন ছড়ায় এজাতীয় বেশ কিছু উদাহরণ মিললেও, আধুনিক কবিদের রচনায় এমন ব্যবহার খুব কম দেখা যায়। (খ) 'একেবারে' পর্বটিতে রুদ্ধদল একটিও নেই। চারটি মুক্তদল, দুটি (কে, রে=৪ মাত্রা) স্থিমাত্রিক, দুটি (এ, বা=২ মাত্রা) একমাত্রিক। প্রসারণ টানের সুযোগ থাকলেও রুদ্ধদলের দোলা নেই। এমন পর্ব মাঝে মাঝে চলতে পারে—একটানা ব্যবহারে ছন্দ কলামাত্রিক প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়,—প্রসারণটানটুকু হারিয়ে যায়। আর একটি উদাহরণ তুলছি :

কাজিফুল(গ) কুড়োতে(ঘ) পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুম্‌ ঝুম্‌(ঙ) পা ঝুম্‌ ঝুম সীতারামের খেলা॥

(গ) 'কাজিফুল' পর্বটি ত্রিদল,—একটি রুদ্ধদল, দুটি মুক্তদল,—তিনটিই স্থিমাত্রিক। (ঘ) 'কুড়োতে' পর্বটি ত্রিদল—তিনটিই স্থিমাত্রিক মুক্তদল।—এমন উদাহরণ ছড়ায় ছাড়া বিরল। (ঙ) 'হাত্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌' পর্বটিও ত্রিদল—তিনটিই স্থিমাত্রিক রুদ্ধদল।—এখানে দেখছি অনেক-গুলি পর্বই চতুর্দলমাপা রাখা হয়নি—তবে ছমাত্রার হিসাব প্রতি পর্বেই রয়েছে। আর সব মিলিয়ে—এছন্দ প্রকৃতির রুদ্ধদলের দোলা এবং মুক্তদলের প্রসারক টানও ঠিক রক্ষিত হয়েছে। আরও উদাহরণ তোলা যাক্‌ :

যমুনাবতী (।×) সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন (×) শ্বশুর বাড়ী কাজিতলা দিয়ে॥

(।×) 'যমুনাবতী' পর্বটিতে পাঁচটি মুক্তদলে ছয় মাত্রা (তী=২ মাত্রা)। এই পাঁচটি মুক্তদলের

উচ্চারণ করতে গেলে যেন ছন্দের গতিস্পন্দ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে 'যমুনাবতী' উচ্চারণ করলে যেন অতিরিক্ত ভারবাহ্‌ল্য কমানো যায়—ছন্দের গতিস্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। (×) 'যমুনা যাবেন' পর্বটিতে চারটি মুক্ত এবং একটি রুদ্ধ—মোট পাঁচটি দল—ছমাত্রা। এ উচ্চারণেও স্বাভাবিক গতি চঞ্চলতা, ছন্দ-উদ্বেলতা স্তিমিত হয়ে আসে।—অন্যান্য পর্বের তুলনায় এটি যেন ওজনে কিছুটা ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু কথাটিকে বদলে 'যমুনা যাবে' করলে সেই স্বাভাবিক চলার ছন্দগতি ফিরে আসে। এখানে দেখছি রুদ্ধ, মুক্ত মিলিয়ে পাঁচটি দলের ভার এ ছন্দের পর্বে সইছে না। তেমনি চারটি রুদ্ধদলের ভারও এ ছন্দের স্বাভাবিক চলার গতিকে রুদ্ধ করে দেখা যায় :

অনেক বাক্য হানাহানি,
গর্জন বর্ষণ (×।) অনেকখানি।

(×।) 'গর্জন বর্ষণ' পর্বটিতে চারটি রুদ্ধদল (গর্, জন্, বর্, ষণ্)। ছমাত্রায় উচ্চারণ করতে হলে অন্ততঃ দুটি রুদ্ধদলকে একমাত্রিক ভাঙ্গতে ঠেশে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু এ ছন্দে কলার সম্প্রসারণ চলে, সঙ্কোচন চলেনা—সুতরাং দ্বিকল (রুদ্ধদল) ধ্বনিকে একমাত্রায় আনতে গেলে ছন্দের তালরক্ষা বা লয়-রক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে।—ঠিক এই এক কারণেই তিনটি রুদ্ধ× একটি মুক্তদল সমন্বয়ে গঠিত পর্বও ছন্দের চলার গতি ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য। যেমন :

সতীদাহ গেছে উঠে কন্যাদাহ থাকবে কি?
রোগের ঋণের শেষ রাখনা কলঙ্কের শেষ (×।।) রাখবে কি?

(×।।) 'কলঙ্কের শেষ' পর্বে একটি মুক্ত এবং তিনটি রুদ্ধদল রয়েছে। মুক্তদলে একমাত্রা গেলে তিনটি রুদ্ধদলে পাঁচমাত্রা ভাগ করতে হবে—অর্থাৎ অন্ততঃ একটি রুদ্ধদলকে দ্বিকল bimoric মর্যাদা না দিয়ে একদল বা একমাত্রা মর্যাদা দিতে হবে।—এই রুদ্ধদলের একমাত্রিক সঙ্কোচন এ ছন্দের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তার জন্যেই উচ্চারণ সমতা—তাল, লয়ের সমতা রক্ষা কঠিন হয়।

এবারে কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বলা যেতে পারে। 'সেই ছন্দকে কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দ বলে, যার, (ক) কলার (বা মুক্তদলের) মাত্রা প্রসারণ (সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক, কদাচিৎ ত্রিমাত্রিক) ঘটে, (খ) রুদ্ধদল এবং প্রসারক মুক্তদলের স্বচ্ছন্দ বহুল ব্যবহারে 'দোলা' এবং 'মীড়ানের' সঙ্গীতধর্মী উদ্বেলতা প্রকাশ পায়, (গ) প্রতি পূর্ণ পর্বে সাধারণতঃ চারটি বা তার কম দল থাকে, (ঘ) পূর্ণ পর্বে ছয় মাত্রা থাকে, (ঙ) রুদ্ধদলের একমাত্রিক সঙ্কোচন স্বীকৃত হয়না, (চ) দ্বিমাত্রা প্রসারক কলা (বা মুক্তদল) এবং দ্বিমাত্রিক রুদ্ধদল সমন্বয়ে চতুর্দল—ষট্ মাত্রিক পর্বই আদর্শ পর্ব, (ছ) দুটি বিচিত্র দলবিন্যাসে নিম্নরূপ ষট্‌মাত্রিক পর্বগুলি স্বীকৃত হয় : (।) দুটি এক মাত্রিক মুক্তদল+একটি দ্বিমাত্রিক মুক্তদল+একটি দ্বিমাত্রিক রুদ্ধদল, (।।) দুটি একমাত্রিক মুক্তদল+দুটি দ্বিমাত্রিক রুদ্ধদল, (।।।) একটি দ্বিমাত্রিক মুক্তদল+দুটি দ্বিমাত্রিক রুদ্ধদল, (IV) দুটি দ্বিমাত্রিক মুক্তদল+দুটি একমাত্রিক মুক্তদল, (V) দুটি দ্বিমাত্রিক মুক্তদল+একটি দ্বিমাত্রিক রুদ্ধদল, (VI) তিনটি দ্বিমাত্রিক মুক্তদল, (VII) তিনটি দ্বিমাত্রিক রুদ্ধদল, (VIII) দুটি ত্রিমাত্রিক রুদ্ধদল।

এই বিস্তৃত সূত্রকে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যায় :

যে ছন্দের পর্বমাপ চতুর্দল (বা কম), ছয়মাত্রা, যার মধ্যে রুদ্ধদলের দোলা এবং কলার মাত্রা-প্রসারক উদ্বেলতা প্রকাশ পায় সেই ছন্দ প্রকৃতিকে কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দ বলে।

আরও ছোট সূত্র দেওয়া চলে :

রুদ্ধদল-দোলা সমন্বিত, কলা-মাত্রা-প্রসারণ-উদ্বেলিত চতুর্দল-ষট্‌মাত্রিক পর্ব-ছন্দের নাম,

কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দ।

কলার মাত্রা প্রসারণ না করে শুধু রুদ্ধদল বেশী আমদানী করে চতুর্দল ষট্‌মাত্রিক ছন্দেও কবিরা কবিতা লিখেছেন, সেগুলিকে পর্বঝোঁক থাকা সত্ত্বেও আমরা কলা-মাত্রিক প্রকৃতির ছন্দ বলছি।—তার প্রধান কারণ, সে ছন্দে 'মীড়ানের'—কলা মাত্রা প্রসারণের বিশেষ উদ্বেলতা নেই। রবীন্দ্রনাথের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

'হটাৎ তখন 'সূর্য ডোবার 'কালে,
'দীপ্তি জাগায় 'দিক ললনার 'ভালে।
'মেঘ ছেড়ে তার 'পর্দা আঁধার 'কালো,
'কখন সে পায় 'স্বর্গ লোকের 'আলো।
'পরম আশার 'চরম প্রদীপ 'জ্বালো।

স্বীকার করছি এ ছন্দে প্রত্যেক পর্বের প্রথমেই ঝোঁক পড়ছে; বিশুদ্ধ কলা-মাত্রিকে রূপ দিয়ে অর্থাৎ কোনও পর্বের সবদলগুলিকেই একমাত্রিক কলার (মুক্তদলের) মর্যাদা দিয়েও সেই পর্ব-ঝোঁক রক্ষা করা সম্ভব নয়কি? এই কবিতাই ঈষৎ পরিবর্তিত করে যদি লিখি :

দেখি তখনি 'সূর্য ডোবার 'কালে,
জেগেছে দীপ্তি 'দিক ললনার 'ভালে।
ছেড়ে মেঘ তার 'পর্দা আঁধার 'কালো।
পেল সে কেমনে 'স্বর্গ লোকের 'আলো।
পরম আশার 'চরম প্রদীপ 'জ্বালো।

প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন এটি বিশুদ্ধ কলামাত্রিক ছন্দের কবিতা। কিন্তু পর্বপ্রথমে ঝোঁক দিয়ে পড়তে কিছুই অসুবিধা হচ্ছে না। প্রথম উদাহরণটির সঙ্গে দ্বিতীয় পরিবর্তিত উদাহরণটির উদাহরণ প্রকৃতিতে মৌলিক কোনই প্রভেদ ঘটেনি। সুতরাং পর্বঝোঁক একমাত্র কলা-প্রসারণ মাত্রিক ছন্দেরই বৈশিষ্ট্য মনে করার যুক্তি নেই। পর্বঝোঁক না রেখেও কলা প্রসারণ মাত্রিক ছন্দ রচনা যে কিছু অসম্ভব নয়, তারও একটি উদাহরণ আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকে তুলে দিচ্ছি :

তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপনসীমা ছাড়ায় বহু দূরে;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুরে;
অতীতকালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে।

সাধারণ রুদ্ধদল দোলা ছাড়া—যাকে পর্ব ঝোঁক foot-stress বলে তা এখানে অনুপস্থিত। ঝোঁক প্রধান কলামাত্রিক ছন্দ শুধু ছমাত্রা নয়, পাঁচ, চার, তিন বা তিন+চার মিশ্র মাত্রা পর্বেও রচিত হতে পারে। তেমন কয়েকটি উদাহরণ তুলছি : পাঁচ মাত্রার পর্ব :

পটাশ্ পট্ পটাশ্ পট্
ছি-ড়িস্ সব স্নেহাস্পদ্
তাতেই পোর্ আখের্ তোর।
কাঁধের তোর ঝুড়ির খোল্
পটোল্ তোল্
পটোল্ তোল্।

চার মাত্রার পর্ব :

পানবিনে ঠোঁট রাঙা চোখ কালো ভোমরা
রূপশালী ধান্ ভানা রূপ দেখো তোমরা

তিন মাত্রার পর্ব :

শিষ্‌কে দেয়গো আজ
তারকি ভিনগা ঘর ?
দুখ্‌সে তার্‌কি পর,
চাঁদসে তার্‌কি তাজ ?

তিন+চার মাত্রা পর্ব :

ভাস্‌ছে বিল্‌খাল্ ভাস্‌ছে বিলকুল্
ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টায় হাসছে জুঁইফুল।

এর প্রত্যেকটি ছন্দ উদাহরণে পর্ব প্রথমে ঝোঁক রয়েছে। রুদ্ধদলেরও সুস্পষ্ট প্রাধান্য রয়েছে,—তবু এ ছন্দ ঝোঁকপ্রধান কলা-মাত্রিক প্রকৃতির ছন্দ। কলার মাত্রা প্রসারণ অবকাশ এখানে নেই, সেকারণেই 'মাঁড়টানের' সংগীতধর্মী উদ্বেলতা ফুটতে পারেনি এতে। সরল কলামাত্রিকের লক্ষণের জন্যেই এ উদাহরণগুলিতে কলা-প্রসারণ-মাত্রিকের সুনির্দিষ্ট ছ-মাত্রার বাইরেও বিভিন্ন মাত্রা মাপের পর্বগঠন সম্ভব হয়েছে।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাইশ — কর্ণিকার

বসন্তের ফুল কর্ণিকার। সেকালে নারীদের যে রুচি ছিলো তার পরিচয় তাঁদের প্রসাধন-কলার প্রতিটি আঙ্গিক থেকে পরিস্ফুট হোতো। ঝড়ের কালো মেঘে সোনালি বিদ্যুতের শোভাকে হার মানাবার জন্যে বুঝি বা কালো কেশে তাঁরা সোনালি কর্ণিকার পরতেন। এই কর্ণিকার বরণ-গরবে গরবী, সৌরভের দাবী তার নেই। আমাদের এই যন্ত্র-ঘর্ঘর যুগে কর্ণিকার পরুষ সৌদাল নাম নিয়ে বিরাজমান। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে কর্ণিকার ফুলের বর্ণনা করে কবি বল্‌ছেন :—

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্রীবিধৌ গুণানাং পরাঙ্‌মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তি ॥ ২৮ ॥
বরণ-গরবে গরবী কর্ণিকার, নাহিকো গন্ধ, বেদন জাগায় মনে,
মনে হয় বুঝি বিশ্বস্রষ্টা সব গুণ দিতে নারাজ একটি জনে।

উমার দেহ সাজাতে নানা ফুলের ডাক পড়েছে। কর্ণিকার সেই গরবী ফুলদের অন্যতম। কুমারসম্ভবম-এর তৃতীয় সর্গে উমার সাজের এই বর্ণনা আছে :—

অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩ ॥
অশোকফুলে পদ্মরাগ মাণিক হোলো লাঞ্ছিত,
কর্ণিকার নিলো সোনার স্থান,
সিন্ধুবার রাজিল যেথা মুকুতা হোতো বাঞ্ছিত,
ফাগুনের ফুল দিল দেহে অবদান।

সেই তৃতীয় সর্গেই শিবের চরণে প্রণতা উমার এই বর্ণনা করেছেন কালিদাস :—

উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২ ॥
মাথা নত করি প্রণমে শিবেরে যবে উমা গিরিসুতা,
তখন তাঁহার প্রণতির কালে হোলো এই অঘটন,
নীলকেশ হতে খসিয়া পড়িল নবীন কর্ণিকার,
কান হতে ঝরে পড়িল ধূলায় পল্লব-আভরণ।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত বর্ণনায় কর্ণিকার বার বার দেখা দিয়েছে :—

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকম্।
পুষ্পপ্রফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্য ॥ ৫ ॥
নারীর কর্ণ-ভূষণ-যোগ্য কুসুম কর্ণিকার
ঘন কালো কেশ-ভূষণ অশোক ফুল,
নবমল্লিকা তরুটি ভরিয়া ফোটে যে কুসুমদল,
রূপে ভরে দেয় নারীর দেহের কূল।

কিং কিংশুকৈঃ শুক-মুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং কিং কর্ণিকার-কুসুমৈর্ন কৃতং নু দগ্ধম্।
যৎকোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্ব্বচোভির্যূনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি ॥ ২০ ॥

শুকের চঞ্চু সম বঙ্কিম কিংশুক ফুলদল
যুবতীর হিয়া করে নি কি বিদীরণ?
কর্ণিকার কি করে নি দগ্ধ নারীর কোমল হিয়া,
কোকিল আবার কেন করে নিপীড়ন?

সমদমধুকরাণাং কোকিলানাঞ্চ নাদৈঃ
কুসুমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যাঃ।
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্মানসং মানিনীনাং
তুদতি কুসুমমাসো মন্মথোদ্বেজনায় ॥ ২৭ ॥

মত্তভ্রমর-গুঞ্জন আর কোকিলকূজন-রবে
আম্রমুকুল ও কর্ণিকারের তীক্ষ্ন সায়ক-পাশে,
নিতি ব্যথা হানে নব বসন্ত নারীর কোমল প্রাণে
প্রেমের দীপন জাগাবার অভিলাষে।

রঘুবংশম্-এর নবম্ সর্গে বসন্তের বর্ণনা করে কবি বল্ছেন ঃ—

হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং তদলকে দলকেসরপেশলম্ ॥ ৪০ ॥

বনলক্ষ্মীর কনকাভরণ তার যেন প্রতিনিধি
আগুনের মতো উজল-দীপ্তি কুসুম কর্ণিকার,
প্রমোদ-মত্ত প্রমদাগণের চূর্ণ কেশের পরে
পরাইয়ে দিলো কর্ণিকার নব কিশলয় তার।

বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অঙ্কে নিদাঘ দিনের বর্ণনায় দেখি ঃ—

উষ্ণার্ত্তঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলালবালে শিখী
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারমুকুলান্যাশেরতে ষট্পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে
ক্রীড়াবেশ্মনি চৈষ পঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে ॥ ১৭৫ ॥

নিদাঘ তাপেতে কাতর ময়ূর তরু-আলবালে শুয়ে,
কর্ণিকারের কুঁড়িটি ফুটায়ে শোয় অলি তার পরে,
তপ্ত সলিল ত্যজি মরালেরা কমলের ছায়া খোঁজে,
প্রমোদ কক্ষে পিঞ্জরে শুক জল জল করে মরে।

বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর তৃতীয় অঙ্কে এই বর্ণনাটি রয়েছে। রাজাকে আসতে দেখে কঞ্চুকী বল্ছে ঃ—

পরিজনবণিতাকরার্পিতাভিঃ।
পরিবৃত এষ বিভাতি দীপিকাভিঃ।
গিরিরিব গতিমানপক্ষসাদা-
দনুতটপুষ্পিতকর্ণিকারযষ্টিঃ ॥ ১৮ ॥

দীপ হাতে সব অঙ্গনাদল ঘিরে চলে নৃপতিরে,
দীপ-উজ্জ্বল রাজ-দেহ মরি কি মোহন শোভা তার,

মনে হয় যেন অটুট-পক্ষ গিরি এক চলে ধীরে,
সানু দেশে তার ফুলভরে হাসে সোনালি কর্ণিকার।

তেইশ — বকুল

বকুল উপেক্ষিত হয় নি সত্যি কিন্তু বকুল তার পূর্ণ সমাদর লাভ করে নি মহাকবির কাছ থেকে। বিলাসিনীদের কাছে পেলবতার, কোমলতার কি কোন কদর আছে?

রূপের উজ্জ্বলতা ও গন্ধের তীব্রতা তাদের মনোহরণ করে। বকুলের রূপ স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে প্রাণ ভরে দেয়, বকুলের যে গন্ধ বেদনার মতো প্রাণের প্রতিটি শিরাকে অবশ করে দেয়, সেই রূপ ও সেই গন্ধ কি বিলাসিনীদের ভালো লাগ্তে পারে! উজ্জয়িনীর সুন্দরীরা মুখের মদিরা-সিঞ্চনে বকুল ফোটাতেন বটে কিন্তু সে নেহাৎ শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, বকুলের প্রতি প্রাণের টানে নয়। কালিদাসও বকুলের অনুরাগী ছিলেন না। বকুল তার পূর্ণ মর্যাদা পাবার জন্যে বহু শতাব্দী অপেক্ষা করে ছিলো। সে গৌরব পেলো বকুল বিশ্বের আর এক মহাকবির কাছে—রবীন্দ্রনাথের কাছে। মেঘদূতম্-এর উত্তর মেঘে যক্ষ অলকায় তার বাড়ির বর্ণনা করে মেঘকে বল্ছে ঃ—

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্খত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

সেথা রক্ত-অশোক বকুলেতে নব-পল্লব-শিহরণ,
মাধবীকুঞ্জ বিরাজে সেথায় কুরবকবীথি মাঝে,
অশোক সে চায় তোমার সখির বামপদপরশন,
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মদিরা যাচে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্এর চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার দুষ্মন্তের রাজধানীতে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের কাছে পাঠানো হচ্ছে। সখিরা মহা আনন্দে তাকে সাজাতে ব্যস্ত। অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে বল্ছে ঃ—তেন হি এতস্মিন্ চূতশাখাবলম্বিতে নারিকেল-সমুদ্গকে এতন্নিমিত্তম্ এব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেশরমালিকা। তৎ ইমাং হস্ত-সন্নিহিতাং কুরু ॥ ৪৫ ॥ "এই যে আমগাছে ঝোলানো নারিকেল পাতার তৈরী ঝাঁপিটা দেখ্ছো, ওর মধ্যে শকুন্তলার যাবার দিনে তাকে সাজিয়ে দেবো বলে এক গাছি বকুলের মালা রেখেছি। ঐ মালাটি নিয়ে এসো।"

উমা যাচ্ছেন তপস্যারত মহাদেবের তপোবনে। তপস্বীর মন ভোলাবার জন্যে সযতনে সেজেছেন পার্বতী। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে আছে তার বর্ণনা ঃ—

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদাম কাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরণে মৌর্ব্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্মুকস্য ॥ ৫৫ ॥

বকুলমালিকা চারুনিতম্বে রচেছে চন্দ্রহার,
খুলে খুলে পড়ে, হাত দিয়ে উমা ধরেন মালিকাখানি,
নিপুণ মদন আপন ধনুর দ্বিতীয় ছিলাটি তার
উমা-নিতম্বে রেখেছিল থুয়ে আপন ভাগ্য মানি।

পার্বতী মদিরা পান করেছেন। মহাদেব তখন পার্বতীকে বলছেন, কেন বৃথা মদিরা পান! কুমারসম্ভবম্‌এর অষ্টম্ সর্গে সেই মনোহর শ্লোকটি আছে :—

আর্দ্রকেশরসুগন্ধি তে মুখং রক্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ।
অত্র লব্ধ বসতির্গুণান্তরং কি বিলাসিনি! মধু করিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥
সিক্ত বকুল সৌরভে ভরা নিতি তব মুখখানি,
আঁখিদুটি তব অয়ি প্রিয়তমা স্বভাবত রক্তিম,
অয়ি বিলাসিনি! মদিরা তোমারে কি মাধুরী দিবে আনি,
যবে সকল সুষমা তোমার আননে নিঃশেষ নিঃসীম।

ঋতুসংহারম্‌-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা-বর্ণনায় বকুল দু-বার দেখা দিয়েছে :—

মালাঃ কদম্বনবকেশরকেতকীভিরায়োজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুমমঞ্জরীভিরিচ্ছানুকূলরচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥
কদমবকুলকেতকীকুসুমে গাঁথিয়া মোহন মালিকা
বিলাসিনী দল আজি কুন্তল বাঁধে,
অর্জুনফুলমঞ্জুরী লয়ে রচি বিচিত্র আভরণ
পরিতেছে তারা কর্ণে কতো না ছাঁদে।

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং বিকসিতনবপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪ ॥
বনফুলযূথীমালতীর সাথে বকুলমালিকাখানি
প্রিয়জন সম সোহাগে ভরিয়া মন,
বধূদের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ষা ঋতু
কর্ণে পরায় প্রস্ফুট নবকদম্ব আভরণ।

রঘুবংশম্‌-এর অষ্টম্ সর্গ। নৃপতি অজ ইন্দুমতীর জন্যে বিলাপ করছেন :—

তব নিঃশ্বসিতানুকারিভির্বকুলৈরর্ধচিতাং সমং ময়া।
অসমান্য বিলাসমেখলাং কিমিদং কিন্নরকণ্ঠি! সুপ্যতে ॥ ৬৪ ॥
তব নিঃশ্বাস সম সুগন্ধি বকুল কুসুম দিয়া
গাঁথিতে আছিনু দুজনে আমরা বিলাস-মেখলাখানি,
সেই মেখলাটি আধখানা গাঁথা, সারা হয় নাই প্রিয়া,
কেন প্রিয়া চিরনিদ্রার কোলে আপনারে দিলে আনি!

রঘুবংশম্‌-এর নবম্ সর্গে রমণীদের ললিত বিলাসবিভ্রমের ছবি এঁকেছেন কালিদাস :—

ললিতবিভ্রমবন্ধবিচক্ষণং সুরভিগন্ধপরাজিতকেসরম্।
পতিষু নির্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ স্মরসখং রসখন্ডনবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥
ললিত বিলাস ও রতির বাসনা জেবলে দেয় অন্তরে
বকুলগন্ধ হয় পরাজিত যার গন্ধের কাছে,
কামনা-জাগানো এমন আসব রমণীরা পান করে,
প্রিয়তম সাথে প্রমদারা সুরা পান করে প্রেম যাচে।

রঘুবংশম্‌-এর একোনবিংশ সর্গে কামোন্মত্ত নৃপতি অগ্নিমিত্র ও মদাকুলা অঙ্গনাদের বর্ণনা রয়েছে :—

সাতিরেকমদকারণং রহস্তেন দত্তমভিলেষুরঙ্গনাঃ।

তাভিরপ্যুপহৃতং মুখাসবং সোঽপিবদ্বকুলতুল্যদোহদঃ ॥ ১২ ॥
নৃপতি অগ্নিমিত্র-মুখ হতে কামনা-জাগানো সুরা
পান করিবারে ছিলো লালায়িত সুন্দরী নারীদল,
নারীদের মুখ হতে সুরা পান তরে ছিলো হিয়া তৃষাতুরা,
বকুলের মতো দোহদপ্রার্থী নৃপতি প্রেম-উচ্ছল।

চব্বিশ — পিয়ালমঞ্জরী

পিয়াল-মঞ্জরীর সৌভাগ্য নেহাৎ কম নয়, সেও কবির কাব্যে স্থান পেয়ে গেছে। কুমারসম্ভবম্‌-এর তৃতীয় সর্গে হরিণদের হয়রাণির বর্ণনা করে কবি বল্‌ছেন :—

মৃগাঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্বনস্থলীমর্ম্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥
পিয়াল কুসুম মঞ্জরী হতে পরাগ উড়িয়া আসি
হরিণদলের নয়নে পড়িয়া করে অন্ধের প্রায়,
পাগলের মতো ছোটে হরিণেরা বন-নিঝুমতা নাশি,
ঝরা পল্লব মর্মরধ্বনি বনতলে বেজে যায়।

পঁচিশ — বন্ধুক, বন্ধুজীবক

সেকালের বন্ধুক, বন্ধুজীবক একালে বাঁধুলী নাম নিয়ে রয়েছেন আমাদের বনে উপবনে। কড়া সুরের দেবভাষার বন্ধুক, বন্ধুজীবকের চেয়ে আমাদের মানবীয় ভাষার বাঁধুলী নামটি হাজারগুণ মিষ্টি। ফুলের নাম অতো কড়া সুরে কানে বাজলে চল্‌বে কেন! লালটুক্‌টুকে মুখটি নিয়ে দেখা দেয় শরতের ফুল বন্ধুক।

মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে বেড়াবার সময় তাঁকে সব চিনিয়ে দিচ্ছেন। কুমারসম্ভবম্‌-এর অষ্টম্ সর্গে তার মনোহারিণী বর্ণনা আছে। মহাদেব বল্‌ছেন :—

দূরমগ্নপরিমেয়রশ্মিনা বারুণী দিগরুণেন ভানুনা।
ভাতি কেশরবতেব মণ্ডিতা বন্ধুজীব-তিলকেন কন্যকা ॥ ৪০ ॥
অস্তরবির কিরণেতে রাঙা পশ্চিম দিক হের,
কি মোহন শোভা ধরেছে বারুণী রঙীন আলোক-সাজে,
বাঁধুলী ফুলের দোদুল কেশর-তিলকে সাজিয়া যেন
নয়ন-ভোলানো সুন্দরী বালা মোদের সমুখে রাজে।

যজ্ঞের সময় রাক্ষসেরা নানা উৎপাত সুরু করে যজ্ঞের নিঘ্ন ঘটাতো। রঘুবংশম্‌-এর একাদশ সর্গে তার বর্ণনা রয়েছে :—

বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভির্বন্ধুজীবপৃথুভিঃ প্রদূষিতাম্।
সম্ভ্রমোঽভবদপোঢ়কর্ম্মণামৃত্বিজাং চ্যুতবিকঙ্কতস্রুচাম্ ॥ ২৫ ॥
বন্ধুক ফুল সম বড়ো বড়ো রক্তের ফোঁটা লেগে
যজ্ঞের বেদী মলিন হয়েছে দেখিলেন সভামাঝ,
দারুনির্মিত যজ্ঞপাত্র ভীষণ ভয়ের বেগে

হাত হতে খসে পড়িল, হইল বন্ধ সকল কাজ।

ঋতুসংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় বন্ধুক তিনবার দেখা দিয়েছে :—

ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞং বন্ধুকপুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ।
বপ্রাশ্চ পক্ককলমাবৃতভূমিভাগাঃ প্রোৎকণ্ঠয়তি ন মনোভুবি কস্য যূনঃ ॥ ৫ ॥

কাজলের মতো মনোহর কালো আজি অম্বরতল
বাঁধুলি কুসুমে নবারুণ ধরাতল,
হের শতদলে সুশোভিত আজি বপ্রার তটভূমি,
তরুণ হৃদয় করে নাকি চঞ্চল?

অসিতনয়নলক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু ক্বণিতকনককাঞ্চীং মত্তহংসস্বনেষু।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ ॥ ২৪ ॥

প্রিয়ার কমল-নয়নের শোভা নিহারিয়া শতদলে
মরাল-কূজনে আভরণ-ধ্বনি স্মরে,
বাঁধুলি কুসুমে হেরিয়া প্রিয়ার চারু অধরের শোভা
আজিকে বিরহী প্রবাসীরা কেঁদে মরে।

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু।
বন্ধুককান্তিমধরেষু মনোহরেষু ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ ॥ ২৫ ॥

অতি সযতনে নারীর আননে থুইয়া চাঁদের শোভা,
মরালের ধ্বনি থুয়ে মণি-মঞ্জীরে,
বাঁধুলি ফুলের কান্তি সঁপিয়া চারু-অধরের পরে
শারদশ্রী মিলাইলো ধীরে ধীরে।

ছাব্বিশ — মালতী

বর্ষার ফুল মালতী শরতেও তার জের টেনে চলে। মালতীর মালা বিলাসিনীদের বেণী-বন্ধনে ও কণ্ঠের শোভাবর্ধনে কাজে লাগ্‌তো দেখা যাচ্ছে। মেঘদূতম্-এর উত্তর মেঘে যক্ষ মেঘকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন পাছে মেঘ গর্জনে ও বিদ্যুৎ-স্ফুরণে নিদ্রিতা যক্ষ-প্রিয়াকে ভীত করে :—

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন প্রত্যাশ্বস্তাং সমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম
বিদ্যুদ্‌গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্র মেথাঃ ॥ ৩৭ ॥

জাগায়ো প্রিয়ারে জলকণাবাহী সমীরণ-পরশনে,
মালতীর কুঁড়ি যথা ফুটে ওঠে ভোরের শীতল বায়ে,
করিও আলাপ অতি ধীরে ধীরে বিরহিণী প্রিয়া সনে,
ভয় যেন নাহি পায় প্রিয়া মোর, রেখো দামিনীরে লুকায়ে।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর তৃতীয় অঙ্ক। মালবিকাকে নিয়ে সমাহিতিকা ও মধুকরিকার আলাপ চল্‌ছে। পরচর্চার স্বভাবনৈপুণ্য মেয়েদের চিরকেলে সম্পদ। মধুকরিকা সমাহিতিকাকে শুধালো—অথ মালবিকাগতং কৌলীনং কিং শ্রূয়তে?—মালবিকা সম্বন্ধে যে কথা রটেছে তার কিছু শুনেছো? সমাহিতিকা—বাঢ়ং কিল তস্যাং সাভিলাষো ভর্ত্তা। কেবলং দেব্যা ধারিণ্যা-

শ্চিত্তং রক্ষন্নাত্মনঃ প্রভুত্বং ন দর্শয়তি। মালবিকাপি এষু দিবসেষু অনুভূতমুক্তেব মালতীমালা ম্লান লক্ষ্যতে। অতঃপরং ন জানে। বিসৃজ মাম্ ॥ ৭ ॥ "মালবিকার উপর প্রভুর বড়োই টান। শুধু পাছে দেবী ধারিণীর মনে খুব আঘাত লাগে এই ভয়ে মহারাজ কিছু করতে পারছেন না। মালবিকাও গলায়-পরে তারপরে ফেলে-দেওয়া মালতীর মালার মতো ম্লান হয়ে গেছে। আর আমি কিছু জানি নে। আমাকে ছেড়ে দাও।"

ঋতুসংহারম্ এর তৃতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনায় মালতীর দেখা পাওয়া যায় তিনবার :—

কাশৈর্ম্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্ব্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২ ॥

কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি মরালে শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী, নবকাশফুলে ধরণী,
ছাতিম পুষ্পে শুভ্র বনানী মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্র বরণী।

শ্যামলতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ ॥ ১৮ ॥

নবকিশলয়-কুসুমের ভারে নুয়ে-পড়া শ্যামালতা
তার কাছে হারে রমণী-বাহুর আভরণ-পরা শোভা,
অশোক কুসুম নব-বিকশিত ফুল্ল মালতী ফুল
হরিতেছে আজ নারীর হাসির কান্তি চিত্তলোভা।

কেশান্নিতান্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্রানাপূরয়ন্তি বণিতা নবমালতীভিঃ।
কর্ণেষু চ প্রবরকাঞ্চনকুণ্ডলেষু নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

কুঞ্চিত ঘন নীল কুন্তলে সাজায় রমণীদল
নবমালতীর মোহন পুষ্প দিয়া,
হেমকুণ্ডল শোভে যেথা নিতি কর্ণের পরে,
সাজায় সেথায় নীল উৎপল নিয়া।

সাতাশ — তিলক

তিলক বসন্তের ফুল। বসন্ত এলে বনের ললাটে তিলক পরিয়ে দেয়। কুমারসম্ভবম্‌এর তৃতীয় সর্গে বসন্তলক্ষ্মীর এই মনোহারিণী বর্ণনা আছে :—

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণকোমলেন চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার ॥ ৩০ ॥

কালো ভ্রমরের কাজল নয়নে এলো বসন্তলক্ষ্মী,
তিলক পুষ্পে অলি-শোভা রচে মুখের পত্ররেখা,
উষার রবির আলোকেতে রাঙা আম্রের মঞ্জুরী
মনে হোলো যেন অধর রাঙায়ে মধুশ্রী দিলো দেখা।

রাজা দশরথ বসন্তসমাগমে বিলাসিনীদের সঙ্গে বিহার করছেন। রঘুবংশম্‌এর নবম্ সর্গে তার বর্ণনা আছে :—

অলিভিরঞ্জনবিন্দুমনোহরৈঃ কুসুমপঙ্‌ক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ।

ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীং ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব ॥ ৪১ ॥

কাজলবিন্দু সম মনোহর কালো ভ্রমরের দল,
বসে যবে তারা তিলক কুসুম পরে,
মনে হয় তবে বসন্ত-শ্রী-উজল বনস্থল
তিলক-ভূষিতা প্রমদার শোভা ধরে।

তিলক ফুলের শুভ্র সৌন্দর্যের অনুপম বর্ণনা আছে রঘুবংশম্-এর নবম্ সর্গে :--

উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বযোগমুপেয়ুষী।
সদৃশকান্তিরলক্ষ্যতে মঞ্জরী তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ ॥ ৪৪ ॥

শুভ্র পরাগ চিত্রিত চারু তিলক কলিকা পরে
কাজল-কৃষ্ণ ভ্রমরেরা যবে দলে দলে এসে রাজে,
মনে হয় যেন তিলক কুসুম সেজেছে সোহাগ ভরে
কালো অলকেতে মুক্তার জাল, যে সাজে রমণী সাজে।

নৃপতি অগ্নিমিত্রের সময় কাটানো ভার হয়ে পড়েছে। মন লাগে না কোনো কাজে। সখা বিদূষককে নিয়ে তিনি প্রমোদ-কাননে বেড়াতে গেছেন। বিদূষক রাজাকে বল্লেন দেখ, ফুলের গহনা পরে বসন্তলক্ষ্মী কি মোহন সাজে সেজেছে! নারীদের প্রসাধন-নৈপুণ্য ম্লান হয়ে যায় এর কাছে।

অগ্নিমিত্র বল্লেন—ঠিক বলেছো, অবাক হয়ে দেখছি বনলক্ষ্মীর শোভা। মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর তৃতীয় সর্গে বনলক্ষ্মীর শোভার বর্ণনা করেছেন কবি :—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিত গুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধন বিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্ ॥ ৩০ ॥

রক্ত-অশোক নারী-অধরের লালিমা-গর্ব হরে,
শ্যাম শ্বেত লাল কুরবক দেয় পত্রলেখারে লাজ,
ললাট-তিলকে তিলক ফুলের অলি-শোভা ম্লান করে,
হতমান হোলো সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা আজ।

আটাশ — পলাশ, কিংশুক

নব বসন্তের প্রতীক যদি কোনো ফুল থাকে তো সে পলাশ। নীল আকাশের কাছে ধরণী তার বসন্তের বাণী পাঠায় পলাশ ফুল ফুটিয়ে। এই রক্তিম প্রেম-নিবেদনের কি তুলনা আছে? এই ফুলের দুটি নাম—পলাশ ও কিংশুক। দুটি নামই মনোহর। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যিনি এই নামদুটি দিয়েছিলেন তিনি বৈয়াকরণিক কিম্বা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন না। পলাশের ভাগ্য ভালো। মহাকবির কাছ থেকেও সে সংযত সমাদর লাভ করেছে। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে আধ-ফোটা পলাশ ফুলের চমৎকার বর্ণনা আছে :—

বালেন্দুবক্রাণ্যবিকশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্ ॥ ২৯ ॥

পলাশ ফুলের রাঙা কুঁড়িগুলি ফোটে নাই ভালো করে,

তাই ধরেছিলো তরুণ চাঁদের মতো বঙ্কিম শোভা,
যেন গো নবানী-নায়িকার দেহে বসন্ত প্রেমভার
আঁকিয়া দিয়াছ রক্তিম রেখা অনুপম মনলোভা।

রঘুবংশম্-এর নবম্ সর্গে বসন্তের বর্ণনা আছে। বসন্ত এলো। মনে হোলো যেন ঋতুরাজ নানা ফুলসম্ভারে রাজা দশরথের সেবা করবার জন্যেই উপস্থিত হয়েছেন :—

উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুকে।
প্রণয়িণীব নখক্ষতমণ্ডনম্ প্রমদয়া মদযাপিতলজ্জয়া ॥ ৩১ ॥

শীত অবসানে নব বসন্ত সাজাইলো কিংশুকে
রক্তবরণ মুকুলের আভরণে,
যেমতি কামনী মদ-বিহ্বলা নিবিড় সোহাগ সুখে
রক্ত-চিহ্ন আঁকে প্রিয়-দেহে নখ দিয়া রতি-ক্ষণে।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত-বর্ণনায় পলাশ দেখা দিয়েছে তিনবার—

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্ম্মরুতাবধূতৈঃ সর্ব্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্ত-সময়ে হি সমাদ্রিতেয়ং রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥ ১৯ ॥

বসন্ত বায়ে কেঁপে-কেঁপে ওঠে দীপ্ত বহ্নি সম পুষ্পের ভারে অবনত কিংশুক,
নব বসন্ত এসেছে বলিয়া পরেছে ধরণী যেন নববধূসম রক্তিম অংশুক।

কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং কিং কর্ণিকারকুসুমৈর্ন কৃতং নু দগ্ধম্।
যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্ব্বচোভির্যূনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি ॥ ২০ ॥

শুকের চঞ্চু সম বঙ্কিম কিংশুক ফুলদল যুবতীর হিয়া করে নি কি বিদারণ,
কর্ণিকার কি করেনি দগ্ধ নারীর কোমল হিয়া, কোকিল আবার কেন করে নিপীড়ন।

ঋতুসংহারম্-এর বসন্তবর্ণনার শেষ শ্লোকটির তুলনা নেই। সেই শ্লোকটিতে পলাশ তার যোগ্য মর্যাদা পেয়েছে :—

আম্রী মঞ্জুলমঞ্জরী বরশরঃ সৎ কিংশুকং যদ্ধনুর্জ্যা
যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতশ্ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতা যদ্বন্দিনো লোকজিৎ
সোহয়ং বো বিতরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

মঞ্জুল চূত মঞ্জরীদল রচেছে ধনুর শর,
কিংশুক ফুল রচেছে যাহার ধনু,
ধনুকের গুণ রচেছে যাহার অলিকুল মনোহর,
জোছনা রচেছে শ্বেতছত্রের তনু।
মলয় পবন সেবিছে যাহারে মত্ত বারণ সম,
কোকিল যাহার গায় বন্দনা গান,
সাথে লয়ে সখা বসন্তে আজি অনঙ্গ নিরুপম
সবে মঙ্গল করুক নিত্য দান।

(ক্রমশঃ)

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

সেন সংলাপ।

মিরকোর যেমন সকলকে কাছে টানবার আকর্ষণীশক্তি ছিল বন্ধু সেন-এর মধ্যেও দেখেছিলাম মানুষকে নিকটে আনবার সেই অদ্ভুত অভিব্যক্তি।

মনে পড়ে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম প্রথমবার লণ্ডন-এ। পকেটে ছিল পাঁচ পাউণ্ড আর এক আমেরিকান্ ডাক্তার বন্ধুকে গচ্ছিত কয়েকটি ছবি বিক্রী করে টাকা পাঠিয়ে দেবার প্রত্যাশা। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ-এর কাছ থেকে নিয়েছিলাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের খবর দিয়ে স্যার উইলিয়াম রোদেন্‌স্টাইন্‌-এর নামে একখানি পরিচয়পত্র। ভেবেছিলাম সেই চিঠিতেই আমার সব আকাঙ্ক্ষার সুরাহা হয়ে যাবে। তিনি ছিলেন লণ্ডনের রয়াল' কলেজ্ অফ্ আর্টস্‌-এর অধ্যক্ষ এবং তাঁর আরো বিশেষ পরিচয় ছিল ভারতভক্ত ও ভারতীয়দের বন্ধু বলে।

পয়সা বাঁচাতে পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছিলাম তাঁর ঠিকানায় পেঁাছানর উদ্দেশ্যে। যদিও জানতাম না কতদূরে সে বাড়ী। অনেক হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বসে পড়ায় আজও মনে আছে দয়ালু এক ট্রাক ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে কোথায় যেতে চাই জিজ্ঞাসা করে তার বাহনে আমায় পেঁাছে দিয়েছিল স্যার উইলিয়াম-এর বাড়ীতে। প্রায় পৌণে একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অধ্যক্ষ মহাশয়ের দর্শনলাভ হল। তিনি বল্লেন "দেখ আমি রয়াল্ কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে এখন রিটায়ার করেছি কাজেই তোমাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না।" বুঝলাম আমি ভারতীয় শিল্পী ও তাঁর দর্শনপ্রার্থী লেখায় তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে আমি তাঁর সাহায্য প্রত্যাশী। যদিও তাঁর সঙ্গে দেখা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাই, স্যার উইলিয়াম নিজে থেকে তা আন্দাজ করে বিনা আলাপে এমন নিরাশা দেওয়ায় আমি ক্ষুব্ধ হলাম এবং বল্লাম "মহাশয় আপনার সাহায্য চাই এ কথা তো বলিনি। শুনেছিলাম আপনি ভারতবন্ধু এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণ্ আমার মারফত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুসংবাদ পাঠিয়েছেন তাই এসেছি আপনাকে দেখতে ও সে সংবাদ দিতে।"

এই কথা বলতেই তাঁর ব্যবহার ও কথার সুর বদলে গেল। যেন আমি হয়ে গেলাম তাঁর বহু পরিচিত পুরাতন বন্ধু। আমার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন "এস হে এস ভিতরের কামরায় চল, চা খাও। বল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন আছেন? তাঁর সঙ্গে শেষ কবে তোমার দেখা হয়েছে?" ইত্যাদি। তাঁর এই আপ্যায়ন বেশ কৃত্রিম লাগল। ভাবলাম কলিকাতার চোরা বাজারে কিনে ধোলাই করা পুরনো সু্যট আর চাঁদনী চকে সওদাকরা সস্তার সার্ট ও টাই পরা এই অধম শিল্পী স্যার উইলিয়ামের ড্রয়িংরুমকে অশুচি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখে শুধু যে শুদ্ধিলাভ হল তা নয় চা-ও পাওয়া গেল। কিন্তু অনেক চিনি ঢেলেও স্বাদে তিক্ততা দূর করা গেল না। তাঁকে অভিবাদন করে বিদায় নিলাম। পকেট থেকে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ্‌-এর লিখিত পরিচয়পত্র তাঁকে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি।

ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্স ইউনিয়ান-এ ডাঃ বীরেশ গুহর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমি লণ্ডনে

কাউকে চিনিনা বলায় তিনি একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন লিটল্ রাসেল্ ষ্ট্রীট-এ একটি বইয়ের দোকানে। দোকানটির নাম ছিল "বিব্‌লিওফিল্" এবং এর মালিকের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর নাম ডাঃ শশধর সিংহ। আগেরদিন আমার আমেরিকান ডাক্তারবন্ধু প্রেরিত ছবি বিক্রীর দরুণ একশো বিশ পাউণ্ড পেয়ে ঠিক করেছি শিগ্গির পারীতে যাব কারণ লণ্ডনে মিউসিয়াম ও আর্ট গ্যালারি দেখা ছাড়া শিল্প শিক্ষালাভের কোন সুযোগ ও সুবিধা পাইনি। ডাঃ সিন্‌হা জিজ্ঞাসা করলেন আমি পারীতে কাউকে জানি কিনা এবং না বলায় তিনি বল্লেন "একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি এক ভদ্রলোক আসছেন, তিনি পারীতে প্রায়ই যান, আপনাকে অনেক খোঁজ খবর দিতে পারবেন।" কিছুক্ষণ পরেই মাঝারি সাইজের এক বাঙালি ভদ্রলোক আসতে ডাঃ সিন্‌হা পরিচয় করিয়ে দিলেন "ইনি সেনগুপ্ত এখানে সংক্ষেপে সবাই এঁকে ডাকে শুধু সেন বলে।" ভদ্রলোকের ব্যাক্‌ব্রাস করা ঘন কাল চুলের তরঙ্গ, সমান ও মসৃণ কপাল, সোজা ক্লাসিকাল টাইপের নাক এবং সবমিলিয়ে বেশ মানানসই মুখ দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে এক সুপুরুষ যুবক ছাড়া তাঁর আর কোন বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তাঁর গাঢ় ওয়াইন্ রঙের চোখের দিকে চাইলে উপলব্ধি হোত যে ঐ গভীর ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির পথ ধরে স্পর্শ করা যায় একটি তেজ ও প্রভাময় স্ফুলিঙ্গের উত্তাপকে। তিনি নিভে যাওয়া পাইপে নিষ্ফল টান দিয়ে, তাম্রকুটের ভস্মপূর্ণ আধারটি নেড়ে চেড়ে যখন নিশ্চিত হলেন যে তার থেকে মৌতাতের আদৌ আর সম্ভাবনা নাই তখন আরম্ভ করলেন আমার সঙ্গে পরিচয়। "পারীতে কোথায় উঠবেন ঠিক করেছেন" না বলায় বল্লেন "ফরাসী ভাষা কিছুটা জানেন নিশ্চয়ই।" জানালাম "না মশাই কেবল 'উই' আর 'নো' ছাড়া আর কোন ফরাসীশব্দ জানিনা।" স্তম্ভিত হয়ে সেন বল্লেন "মশাই ওদেশে এরকম বেপরোয়াভাবে গেলে মারা পড়বেন। আপনাকে দু'একজন বাঙালি ছাত্রের নাম ও ঠিকানা দিচ্ছি এরা আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে" বলে খবরের কাগজের সাদা মার্জিন্ ছিঁড়ে' তাইতে লিখে দিলেন তাদের নামধাম। যদি কোন মুস্কিলে পড়ি তা হলে তিনি দিন দশেকের মধ্যে পারীতে আসছেন এবং আমার সব হ্যাঙ্গাম মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আবিষ্কার করলাম যে সেন অন্যের নাম ঠিকানা দিয়েছেন কিন্তু পারীতে তিনি কোথায় থাকেন বা থাকবেন তার কোন উল্লেখ নেই। যাদের তিনি নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন পারীতে পেঁাছে ভাষা না জানায় তাঁদের খুঁজে বের করা বেশ দুরূহ হয়েছিল এবং তাঁদের বাড়ী পেঁাছেও কোন সুবিধা হয়নি কারণ তাঁরা সে সময়ে পারীর বাইরে কোথায় সফরে বেরিয়েছিলেন। লাটিন কোয়াটারস্‌-এ আট ঘণ্টা রাস্তায় ইংরাজী বোঝে এমন লোকের খোঁজ করে শেষে একটি ইণ্ডোনেশিয়ান ছাত্রের সাহায্যে থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। ওদেশে পথযাত্রায় পথিককে রক্ষা করেন সেণ্ট ক্রিষ্টোফার। ভাষা না জানা বিদেশীকে দেখবার কোন সেণ্ট আছেন কিনা জানিনা জানলে নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করতাম। ভাষা না জানলেও প্রথম কয়েকদিন অঙ্গ ও মুখভঙ্গীর সাহায্যে নক্‌সা এঁকে কাজ চালিয়ে নিলাম। পরে সেন-এর দেওয়া ঠিকানায় ভদ্রলোক দুটীর সাক্ষাতে ও পরিচয়ে পথে চলার মত ফরাসী কয়েকটি শব্দ আয়ত্ব করে ভর্তি হয়ে গেলাম একাদেমী গ্রাঁদ শমিয়ের্‌-এ।

দেশ থেকে ফ্রান্স ও ফরাসী জাতটা সম্বন্ধে বই ও প্রবন্ধ পড়ে যে ধারণা নিয়ে এসেছিলাম এখন সাক্ষাৎ পরিচয়ে সেই মনে আঁকা ছবির রূপ পরিবর্তন হ'তে লাগল। ছাত্র ছাড়াও ব্যবসাদার, টুরিষ্ট, অ্যাড্‌ভেন্‌চারার কিংবা সরকারী কাজে আগত ভারতবাসীর চোখে ফ্রান্স-এর

পরিচয় হয় ভিন্ন ভিন্নভাবে এবং এই বিভিন্ন পেশা ও স্তরের লোকেরা দেশে প্রচার করে তাদের ধরে নেওয়া দেশটার রূপ ও চরিত্র। এদের আনা এই ছেঁড়া, টুকরো ও অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত অভিজ্ঞতাকে অসাবধানী অনেক ভারতবাসী যাচাই করতে গিয়ে হয়েছে অপদস্থ এবং দিয়েছে ভারতবর্ষের নামে অপবাদ।

পারীতে এক মহিলা ছিলেন খুব ভারত ভক্ত। এ'র গৃহে আতিথ্যলাভ করেছিলেন ফ্রান্সে আগত বিখ্যাত বা নগণ্য প্রায় সকল ভারতবাসীরা। যে কোন ভারতীয় পারীতে এসেছে শুনলেই তাকে তিনি লাঞ্চ বা ডিনারে ডাকতেন এ যেন ছিল তাঁর ব্রত। এমন সজ্জন মহিলার আতিথেয়তার প্রতিদান দিয়েছিলেন একটি ভারতবাসী অত্যন্ত গর্হিত ও কদর্য ব্যবহারে। কিন্তু তবুও ভারতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আস্থা একটুও কমেনি।

ঘটনাটি হয়েছিল একজন পাঞ্জাবীকে নিয়ে। ইনি ছিলেন লাহোরের অধ্যাপক পারীতে এসেছিলেন পড়াশুনা করতে। পারী থেকে প্রত্যাগত তাঁর কোন বন্ধু ফরাসী মহিলাদের চরিত্র সম্বন্ধে এই অভিমত দিয়েছিলেন যে তাঁদের কাউকে একটু উপরোধ করলেই নিকটতম সঙ্গসুখ লাভ করা যায়। আর যদি কোন মহিলা পুরুষকে নিমন্ত্রণে আহ্বান করেন তা হলে সেটাকে একটা মধুর মিলন অভিলাষের স্পষ্ট সংকেত বলে ধরা উচিত। ভদ্রমহিলার দুর্ভাগ্য যে এই-ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও যে দু'একজন ভারতীয় ছাত্রদের ডিনারে ডেকেছিলেন তারা খালি না থাকায় নিমন্ত্রণে যেতে পারে নি। অধ্যাপক মাদাম-এর বাড়িতে কেবল তাঁরা দু'জন ডিনার খাচ্ছেন দেখে ধরে নিয়েছিলেন যে আহারের পর দক্ষিণাটাও পেয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে প্রেম-লীলায়। আহারান্তে টেবিলের এপারে ওপারে বসে কফি পান ও বাক্যালাপ অধ্যাপকের মনের মতন হচ্ছিল না। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে তাঁরা মুখোমুখি না হয়ে পাশাপাশী একদিকে বসে আলাপ করলে ভাল হয়। ভদ্রতার খাতিরে মাদাম এতে আপত্তি করেন নি। এই বন্দোবস্তকে মহিলাটি এত সহজে মেনে নিলেন অতএব অধ্যাপকের সৌখিন অভিলাষে তাঁর আপত্তি নেই ভেবে এই পঞ্চনদবাসী পাশে এসেই ভাল্লুকের মতন আক্রমণ শুরু করেছিলেন। সচকিতা ও ত্রাসিতা মাদাম তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলে অধ্যাপক বল্লেন "মাদাম আপনি যদি অনভিজ্ঞা তরুণী হতেন তা হলে আপনার এই কপট ব্রীড়ার খেলা বেশ মানানসই হ'ত। কিন্তু আপনার সে বয়েস যখন পার হয়ে গেছে তখন এই মিথ্যা শিক্ষানবিশীর ছলনা করে সময় নষ্টের কি প্রয়োজন। বিপন্না মাদাম তখন অন্যঘরে পাঠরত তাঁর কিশোর পুত্রের নাম ধরে তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছেন। ছেলেটি দৌড়ে ঘরে আসতে অধ্যাপক বুঝলেন তাঁর বন্ধুর বলা ফরাসিনীদের চরিত্র সম্বন্ধে থিসিস্-এ বেশ কিছু প্রমাদ রয়ে গেছে। তিনি মানে মানে সেখান থেকে লগুড়াহত কুকুরের মত তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।

পানথেওঁর পিছনে ফৈয়ে দেজ্এতুদিয়াঁ সাঁ জেনভিয়েভ্ ছিল ছাত্রদের বেশ সস্তার রেস্তরাঁ। এইখানে একদিন খেতে গিয়ে দেখি কিউতে দাঁড়িয়ে সেন মাঝে মাঝে তামাকবিহীন পাইপে সোঁ সোঁ টান দিয়ে মার্কটাইম করছেন। আমায় দেখে বল্লেন "কি মশায় তা হলে এসে পড়েছেন পারীতে। পথঘাট বেশ চিনে ফেলেছেন দেখছি। আশা করি কোন মুস্কিলে পড়েন নি।" দুজনে ট্রেতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করে টেবিলে খেতে বসলাম। পয়সা বাঁচাতে একবেলা এই রেস্তরাঁয় খেয়ে নৈশাহারের ব্যবস্থা নিজেই করতাম ডিম রুটী, কলা আর ক্রীম কিনে। ফরাসী রুটী সাধারণত হয় প্রায় দেড় কি দুই ইঞ্চি মোটা এবং লাঠীর মতন হাত দুয়েক লম্বা। তাজা অবস্থায় এই রুটী খেতে বেশ মচমচে ও মুখরোচক। এর পুরো সাইজকে বলে "বাগেত" এবং

আধ বাগেত-এর কম রুটী কেনা যায় না। আমার পক্ষে একবারে আধ বাগেত রুটী খাওয়া সম্ভব ছিল না অথচ সকালের রেখে দেওয়া এই রুটী বিকেলে শুকিয়ে চামড়ার মত হয়ে অখাদ্য হ'ত। ভাবতাম আর যদি কেউ আমার মত দৈন্যে থাকে তাহলে এভাবে রোজ রুটী অপব্যয় না করে তার সঙ্গে হয়ত এই আধ বাগেত রুটীকে ভাগাভাগী করে এই অপব্যয়কে বাঁচান যেত। কিন্তু আধ বাগেত রুটীর অংশীদারি লোককে কোথায় খোঁজা যায় এবং জিজ্ঞাসাই বা করি কেমন করে। ফৈয়েতে ছেলেরা ও মেয়েরা খাওয়ার উদ্বৃত্ত রুটীকে টুকরো করে একে ওকে ছুঁড়ে মেরে খেলা করছিল। হঠাৎ চুপ করে রুটীর অপব্যবহারকে দেখতে না পেরে সেনকে বল্লাম "এরা জানে না অভাবপীড়িত লোকের কাছে এই টুকরো রুটীর মূল্য কত। এ কেবল আধ বাগেত রুটী কিনতে যার ম্যানিব্যাগ আড়ষ্ট হয়ে যায় তারই মনে হবে এত রুটীর টুকরো নিয়ে এরা খেলছে না এ তার দৃষ্টিতে হয়ে উঠে যেন জীবন্ত দেহের টুকরো। বিস্ফারিত চোখে সেন একটু ইতস্ততঃ করে বল্লেন "আমি সিকি বাগেত এর বেশী রুটী খেতে পারি না আর বাকিটা রোজ নষ্ট হয়। আপনারও বোধহয় সেই দশা। আপনি যদি দ্বিধা বোধ না করেন তা হলে আমরা এই আধ বাগেতকে ভাগ করে খেতে পারি।" আমরা ঠিক করলাম আমাদের নৈশাহার একসঙ্গে ব্যবস্থা করব। কাজেই সেন-এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও সান্নিধ্য শুরু হয় ঐ আধ বাগেত ফরাসী রুটীকে উপলক্ষ করে। সেন থাকতেন পাঁচতলার ছোট্ট একটি এ্যাটিক ঘরে। এ ঘরের দেওয়াল দেখা যেত না কারণ এর চার পাশে জমি থেকে ছাদ পর্যন্ত বহুসারি বই থাক দিয়ে রাখা ছিল। শুধু তাই নয় এই থাক করে রাখা বই-এর রাশির অতিরিক্ত সংগ্রহ দড়ির সিকেয় বাধা অবস্থায় ছাত থেকে এখানে ওখানে ঝুলান ছিল। অপরিচিত কেউ প্রথমে সেই ঘরে ঢুকলে মনে করত কোন পাগল এই ঘরের বাসিন্দা। এখানে একটা স্পিরিট ল্যাম্প জেলে দুটি ডিম সিদ্ধ করে তার সঙ্গে মরশুমী ষ্ট্রবেরী কি সুপক্ক কদলী ও ক্রীম সহযোগে হ'ত আমাদের নৈশাহার। তারপর বেশ ঘটা করে সেন তৈরী করতেন কফি। মাঝে মাঝে আরো মিতব্যয়িতা করতে আমরা শুধু চীস্ ও রুটীতেই কাজ চালিয়ে দিতাম। সেন খাওয়ার সময় রহস্য করে বলতেন "খান্ মশাই ভাল করে খান্, ধরে নিন্ না আমরা যেন মাক্সিমের মত দুমূর্ল্য রেস্তরাঁয় বসে লাংগুস্ত্ আনা ক্রীম ও প্লাস নাপলেয়' খাচ্ছি তা হলে আমাদের মিতাহার আর ধনীর এইসব বিখ্যাত রেস্তরাঁয় রাজোচিত আহারে কোন বিশেষ তফাৎ বোঝা যাবে না।

সোরবন-এ, ক্লাবে বা ক্যাফেতে ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে স্বল্পভাষী সেনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ত মেয়ে মহলে। আমাদের দৃষ্টিতে আরও ভারতীয় ছাত্রদল যাদের সেনের চেয়ে সুশ্রী বলা যেত কিন্তু মেয়েরা তাদের দিকে ফিরেও চাইত না। আজকালকার তরুণীকুল সম্মোহনকারী ক্রুণার গায়কের উপস্থিতির মতন সেনের আবির্ভাব মেয়েদের হৃদ্চাঞ্চল্যের বেশ একটা কারণ হয়ে যেত। একবার সেন-এর সঙ্গমোহিত একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর এই আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য কি? সে বল্ল "এ কি কথায় বলে বুঝান যায়। রসনা তৃপ্তিকর মিঠাই দেখলে সুখাদ্য-বিলাসীর জীহ্বা হয় বাসনায় আপনা থেকে লালাসক্ত তেমনি সেনকে দেখলে আমাদের মন ওর-দিকে ছুটতে থাকে।" তাদের এই পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগের আধিক্য অন্য কোন পুরুষকে হয়ত করে তুলত আপন প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন ও দাম্ভিক কিন্তু সেন এদের আদরের আতিশয্যকে মোটেই আমল দিতেন না। তিনি বলতেন "মশাই এই ডাকিনীগুলিকে আপনারা দু'একজন মিতালি করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে বিশেষ বাধিত হব।" কিন্তু কার কথা তারা শুনবে! একবার সেন-অনুরক্তা একটী মেয়ে এক ক্যাফেতে ভারতীয় ছাত্রের সম্মেলনে তিনি আসছেন শুনে সর্বাঙ্গে কালো রঙ মেখে উপস্থিত হল। প্রথমে আমরা তার এই রূপান্তরে

তাকে চিনতেই পারি নি। এই সং সাজবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল যে শ্বেতাঙ্গিনী বলে বোধ হয় সেন-এর তাকে পছন্দ হয় না। তাই সে এসেছে ভারতীয় মেয়েদের মত কালো সেজে যদি এখন তাঁর তাকে পছন্দ হয়। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করল ভারতীয় মেয়েদের মত তাকে সুন্দরী দেখাচ্ছে কিনা? বেচারী জানত না যে আমাদের এই বাদামী কি কাল রঙকে একটু ফেঁকাসে করবার প্রয়াসে আমাদের দেশে গাত্রচর্মে কত ক্রীম, খড়ি ও পাউডার দিয়ে ঘসা-মাজা চলে। মেয়েটির চিবুকের নিচে দু'জায়গায় রঙ না লাগায় শ্বেতকুষ্ঠের মত দেখাচ্ছিল। আমরা তাকে আয়নায় সেটা দেখিয়ে দিতে সে অপ্রস্তুত হয়ে হাত ধোবার কামরায় গিয়ে সবরঙ ধুয়ে এল এবং তারপর কাঁদতে আরম্ভ করল এই বলে যে তার সব সজ্জা ও আয়োজন বৃথা হল এখন তার এই সাদা রঙ দেখে সেন আর ফিরেও চাইবে না। এমন সময় বন্ধুবর এসে হাজির হলেন। তাঁকে আমরা মেয়েটির কাণ্ড কারখানা বলতে তিনি হাসতে আরম্ভ করলেন এবং আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম। ক্রোধ ও রোদনবিহ্বলা মেয়েটি আমাদের মুণ্ডপাতের শপথ করে কাফে পরিত্যাগ করল। অবিচলিত সেন নির্বাপিত পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে পরিবেশকের উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন "গারস এ্যাঁ কাফে ক্রেম্ সিল ভু প্লে।"

অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের অনেকে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল "মশাই বেশী মিশ-বেননা সেনের সঙ্গে কারণ ও দাগী লোক। দেশে ছিল সাংঘাতিক রকমের টেরোরিষ্ট অনেক বছর জেল খেটেছে এবং এখন এখানে ও মার্কামারা কমিউনিষ্ট। এই সেদিন ফরাসী সরকার দু'জন ভারতীয় সাংবাদিককে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ করে চলে যেতে হুকুম দিল কারণ তারা ছিল কমিউনিষ্ট। কিছু বলা যায় না কোনদিন সেনকেও যদি তাড়ায় তা হলে আপনাকেও ওর সঙ্গে ভাগতে হবে।

সেনের সঙ্গে আমার কথা হ'ত শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে কিন্তু তাঁর বিপ্লবী জীবন সংক্রান্ত কোন কথা আমরা আলোচনা করিনি। আর আমিও ঠিক করেছিলাম যে তিনি নিজে থেকে ও বিষয়ে কিছু না বল্লে আমার কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করাটা অত্যন্ত অশোভন হবে। একদিন লাঞ্চের সময় তিনি বল্লেন "আজ রাত্রী নষ্ট হবে, নৈশাহার আপনাকে একলা করতে হবে। আমি যাচ্ছি পার্টির এক বিরাট সম্মেলন হবে সেইখানে। জিজ্ঞাসা করলাম পার্টি সভ্য ছাড়া বাইরের লোক এই সম্মেলনে যেতে পারে কিনা। তিনি বিস্মিত হয়ে বল্লেন আপনি যেতে চান নাকি! জানেন না আমি দাগী বিপ্লবী এবং আপনি যে আমার সঙ্গে ডিনার খান এইটে যথেষ্ট বিপদের কথা এর উপর আবার আমাদের পার্টির অধিবেশনে যাতায়াত শুরু করেন তা সেধে বিপদ ডেকে আনা হবে। বল্লাম "মশাই সে ভয় যদি থাকত তা হলে আমাদের এক সঙ্গে খাওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত। আপনার সম্বন্ধে অনেকেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছে এবং যদিও তারা আপনার কীর্তি-কাহিনী আমাকে সবিস্তারে জানিয়েছে তবু আরও খবর জানবার জন্যে আমাকে প্রায়ই ধরপাকড় করে। আমি যদি বলি যে আপনার অতীত জীবন বা আপনার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করিনা এ তারা বিশ্বাসই করতে চায় না। তিনি বল্লেন সে আমি জানি। আমাদের দেশের লোকেরা পরের ঘরের হাঁড়ির খবর বের করতে যেমন উদ্‌গ্রীব এমন আর অন্য কোন দেশের লোকেরা হয় না। ওরা আপনাকে আমার সম্বন্ধে কি যে বলেছে জানিনা তবে তার কতটা সত্যি সে আপনাকে একদিন আমার পুরনো দিনের কথা বল্লে বুঝে নিতে পারবেন। বড়াই করবার মত কিছু হয়নি আমার জীবনে। দেশে একটী জাগরণ এসেছে এবং সেই ইতিহাসে আমি একটা অক্ষর মাত্র।

তারপর একদিন শুনলাম তাঁর ইতিবৃত্ত।

"মশায় দক্ষিণেশ্বরের মামলার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। বোমাগুলি আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম সুটকেসে ভরে। আর আধ ঘণ্টা ওখান থেকে সরতে দেরী করলে পুলিসে আমাকেও জালে ফেলত। বল্লাম "দক্ষিণেশ্বরের বোমা তো অনেক দূরের লাফ। তার আগে কি ঘটনাচক্রে আপনি এরকম একটা জ্বলন্ত বিপ্লবী হলেন সেটা বলায় আপত্তি আছে কি? "না" বলে তিনি শুরু করলেন। "আমি তখন বেশ ছোট বয়েস দশ কি এগারো হবে। বিক্রমপুরে নিজেদের গ্রামে সোনারঙ-এ গিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ী পুলিসে ঘেরাও করে খানাতল্লাসী আরম্ভ করল। শুনলাম আমার সম্পর্কিত এক কাকা ও দাদাকে তারা ধরতে এসেছে। সর্বদাই শুনেছি যে চোর ও বদমাইসদের পুলিসে ধরে। আপনজনের মধ্যে এমন লোক আছে এবং তাদের ধরতে এরা এসেছে মনে করে নিজের উপর বেশ একটা ধিক্কার এল। কাকা ও দাদা পুলিস আসছে আগেই খবর পেয়ে উধাও হয়েছিলেন। তারা বাড়ীর আর সকলের উপর খানিকটা তর্জন ও গর্জন বর্ষণ করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে গেল। অবাক হয়ে শুনলাম যে বাড়ীর লোকেরা তাঁদের পুলিসে ধরতে পারেনি বলে খুব তারিফ করছে তাঁদের উপস্থিত বুদ্ধির। যখন বল্লাম পুলিসে ধরতে আসে এমন অপরাধীর সম্বন্ধে কি করে তাঁরা এধরণের নিলর্জ্জ প্রশংসা করতে পারেন বাড়ীর সবাই আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁরা চোর বদমাইস বলে পুলিসে তাঁদের ধরতে আসেনি। এঁরা বিপ্লবী দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। মোটামুটী বুঝলাম ব্যাপারটিকে। সেই থেকে আমার মনে দুটি কথা চিহ্নিত হয়ে গেল "বিপ্লব ও স্বাধীনতা"।

গোটে ও শিলের

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

পৃথিবীর সাহিত্য জগতে দেখা যায় যে প্রতিভাবান লোকেরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। প্রতিভাবানদের ধ্যান ধ্যারণা কেউ ঠিক বুঝতে পারে না। শিলেরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে গোটে ইটালী ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরেছেন। তার অন্তরঙ্গ সুহৃদরা সকলে নিজের কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন তার ফলে কবির সঙ্গে কেউ সংযোগ যথাযথভাবে রাখতে পারে নি। কবি ভাবলেন তাকে সকলে এড়িয়ে যাচ্ছে কারণ তার ধ্যান ধারণার সঙ্গে কেউ তাল রাখতে পারছে না। ইটালী ভ্রমণ করবার পর তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তার জীবনাদর্শ সকলের চেয়ে বহু উচ্চতে উঠেছিল। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীহীন ভাবে দিন যাপন করতে লাগলেন। এই সময় তার জীবনে এক অন্তরঙ্গ জীবনসঙ্গীর আবির্ভাব হয়—ইনি হচ্ছেন শিলের। তরুণ জার্মাণ মনের ওপর শিলেরের নাম প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য শিলের ও গোটে তারা কেউ বুঝতে পারেন নি যে তারা উত্তর-কালে পরম বন্ধুরূপে পরস্পরে পরস্পরকে পাবেন। উভয়েই দূর থেকে পরস্পরকে চিনে-ছিলেন এবার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হল। বিরোধ ও সন্দেহের আবহাওয়া কুয়াশা দ্বারা জমাট ছিল। গোটে জার্মাণীর শিল্প ও সাহিত্যে জগতের প্রতি বিরূপ ছিলেন। জার্মাণীর জন-সাধারণকে সহজ ভাবে তিনি বোঝবার চেষ্টা করেন নি। শিলেরকেও তিনি দূর থেকে ভেবে-ছিলেন যে শিলেরের শিল্প সত্তা পরিণত নয় তা ছাড়া জার্মাণীতে তখন ঝড়-ঝঞ্ঝাবাদীদের মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। শিলের ছাড়া হাইনসে নামক একজন শিল্পীর নাম করে গোটে বলেছিলেন যে সে শিল্পী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিন্তাধারা অঙ্কন ও ভাস্করের মধ্যে সঞ্চারিত করাবর প্রয়াস করেছিলেন। অবশ্য এই ঝড়-ঝঞ্ঝাবাদী যুগের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে তিনিও এককালে দায়ী ছিলেন এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কারণ আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি তার সাহিত্যের উপজীব্য সামগ্রী বলে গোটেকে অনেকে অভিযোগ করেছিলেন। সন্দেহ, দোষ প্রভৃতি যে মানুষকে অন্ধকারে পরিচালিত করে এবং এই আবর্ত্তে শুদ্ধ সত্তা যে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে না—তা তিনি বুঝে সেই যুগের সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। ভাইমার রাজপ্রাসাদের নরনারীদের বিশেষতঃ নারীদের শিল্প সাহিত্যের ধ্যানধারণা দেখে তিনি প্রীত হতে পারেন নি। অবশ্য তিনি শিল্পীদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে স্বীকার করে-ছিলেন। তিনি এই আশঙ্কা করেছিলেন যে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাদীদের সাহিত্য সৃষ্টি দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে অতলে তলিয়ে দেবে। জার্মাণীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে সব মননশীল ও সুভদ্র ব্যক্তিসম্পন্ন লোক তারাও পথভ্রষ্ট হতে চলেছিলেন। এ-দেখে তিনি কাব্য ও শিল্প-জগৎ থেকে বিদায় নেবার বাসনা করেন।

কারণ উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যের উৎকর্ষতার অর্থ এই যে সেখানে সুন্দর ও সুষ্ঠ লেখা কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। শিলেরের লেখা পড়ে তিনি সাহিত্যের খেই হারিয়ে ফেলেন। গোটের কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করেন যাতে করে শিলেরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কবি নিজে স্বীকার করেছেন শিলেরের সঙ্গ বা পরিচয় তিনি ইচ্ছে করে পরিহার করবার চেষ্টা করতেন। গোটের সঙ্গে ও শিলেরের সঙ্গে যে সব লোকের পরিচয় ছিল তারা মাঝে মাঝে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতেন। জার্মাণ নাট্যমঞ্চে শিলেরের Robber বইখানির খুব কদর।

তারপর DON CARLOS প্রকাশনা হয়। তা তা ছাড়া কাণ্টের ওপর ভিত্তি করে সৌন্দর্য ও মহত্ব বিষয়ে শিলের প্রবন্ধ লেখেন। যদিও প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার মতের মিল ছিল না তবু গোটে লক্ষ্য করেন যে শিলেরের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধীন মনোভাব আছে। শিলের প্রকৃতির যথাযথ রূপকে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি—এই ছিল গোটের মত। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের ওপর শিলেরের আলোকপাত অনেকটা অন্ধ জৈব প্রক্রিয়ার মত বলে গোটে ভেবেছিলেন। উভয়ের আদর্শের সঙ্গে উভয়ের আকাশ পাতাল ফারাক। সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কোন সম্পর্ক উঠতে পারে না। তারা হলেন উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর দুটো প্রান্তবিন্দু। সুতরাং সাক্ষাৎ অসম্ভব। দূরত্ব তাদের অনেক কারণ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বহুদূরে তাদের অবস্থান। তবে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব চেষ্টা করেছিলেন উভয়ের সঙ্গে উভয়ের পরিচয় যাতে হয়। তবুও এই দূরত্ব ও পার্থক্য তাদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাদের মিল এক জায়গায় ছিল। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংগ্রহ করছিলেন জনৈক উৎসাহী। সেখানে গোটেকে যেতে হত কাজ উপলক্ষ্যে আর তা ছাড়া গোটে বিজ্ঞানীও ছিলেন। এইখানে শিলেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও খুচরো আলাপ আলোচনা হত। উভয়েই বিজ্ঞানের প্রতি অনু-সন্ধিৎসু। সেই আলাপ পরিচয়ে গোটে শিলেরের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পান। তবে গোটে বুঝেছিলেন খণ্ড বস্তু ও সত্তার উপরেই শিলেরের দৃষ্টি নিবদ্ধ। গোটে কথাপ্রসঙ্গে শিলেরকে জানান যে প্রকৃতির সত্তাকে বিচ্ছিন্ন না করেও সজীব ও ক্রিয়াশীলকে প্রকৃতির মধ্যে সমগ্রভাবে ধরে খণ্ডের মধ্যে পূর্ণকে প্রকাশ করা যায়। শিলেরের মনে সন্দেহ জাগল কারণ বিজ্ঞানী গোটের মত তার জানা ছিল না অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও মূল্যকে। পরিচয় গাঢ় হল যখন গোটে তার আবিষ্কিয়া—উদ্ভিদের রূপান্তরের মৌলিক অবদানের কথা শিলেরকে বলেন। নানা রকম হাবভাব ও ইংগিতের আভাষ সে আলোচনাতে ছিল বলে শিলের সেই বিশ্লেষণ সহজেই বুঝতে পারেন। তবুও শিলের মন্তব্য করলেন এই বলে যে গোটে যা বলেছেন তা পরীক্ষা বা প্রয়োগ কিছু নয়, তা কল্পনার ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

শিলের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের ওপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ-প্রবন্ধ গোটের মনঃপূত হয় নি এই প্রবন্ধের ওপর তীব্র সমালোচনা করবার গোটের প্রবল ইচ্ছা হয়। তবু তিনি নিজেকে সংযত করে জানালেন শিলেরকে এই বলে যে মতান্তর হওয়া স্বাভাবিক তবু কল্পনাকে না বুঝে, পরখ না করে কোন জিনিষকে তিনি কল্পনার জগতে স্বীকার করেন না। গোটে নিজে লিখেছেন আকর্ষণ করবার ক্ষমতা শিলেরের ছিল। গোটের সঙ্গে শিলেরের মতের মিল হল না। শিলের কোন রকম উষ্মা প্রকাশ না করে তার সম্পাদিত 'হোরেন' পত্রিকার জন্য গোটের কাছে লেখা চাইলেন। দুই বীরের যুদ্ধ সমাপ্ত হল শান্তির সর্ত্তে। তবু শিলের ও গোটে এই দুই সাহিত্যরথী যে যুদ্ধে অপরাজেয় তা বেশ বোঝা গেল। তবু গোটের মতবাদের বিরুদ্ধে শিলের বললেন যে অভিজ্ঞতা কল্পনা দিয়ে আহরণ করা হয়ে থাকে। কল্পনার অন্ভূত রূপ এই যে অভিজ্ঞতার কাছে কল্পনা অগ্রসর হতে পারে না। গোটের এ-সব কথা ভাল লাগে নি, তবুও অভিজ্ঞতাকে যদি তিনি কল্পনা বলে মেনে নেন কারণ এমন মধ্যপথ আছে যেখানে উভয় উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। একই বিষয়ের কর্তা এবং কর্ম কে এই মূল বস্তু নিয়ে উভয়ের মতান্তর হলেও শিলেরকে তিনি সানন্দে লেখা দেবার স্বীকৃতি জানালেন। তা ছাড়া শিলেরের পত্নীর সঙ্গে গোটের পরিচয় অনেক দিন থেকে ছিল এবং পরিচয়ের সূত্র দানা বাঁধল। শিলের গোটেকে দ্বিতীয় যৌবন দিলেন তার ছোঁয়া দিয়ে। এক উচ্ছ্বসিত কাব্যের জোয়ার গোটের জীবনে এল। ফরাসী বিখ্যাত সাহিত্যিক স্তাঁধাল যিনি তার তীক্ষ্ণ কলমের দ্বারা ইউরোপের

সমস্ত জাতি এমন কি রেনেসাঁসকে পর্যন্ত ব্যঙ্গ করেন তিনি বলেছিলেন জার্মানীতে একজন লোক আছেন যিনি মহৎ; তিনি হচ্ছেন শিলের, গ্যেটেকে স্তাঁধাল তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এই বলে যে গ্যেটের সাহিত্যচর্চা একটা প্রহসন মাত্র। গ্যেটে বিষয়ে স্তাঁধাল যা বলেছেন তা ঠিক না হলেও শিলের বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা গ্রহনীয় কারণ শিলের গ্যেটেকে সুনিপুণ শিল্পীর মত বিশ্লেষণ করে তার কবি সত্তার উৎসকে উৎসারিত করে দিয়েছিলেন।

অবশ্য শিলেরও কখনও ভাবতে পারেননি গ্যেটের সঙ্গে তার পরিচয় হবে। যখন তার মাত্র আটাশ বছর বয়স সেই সময় শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ভাইমারের ডিউকের কাছে আসেন। সেই সময় গ্যেটে ইটালীতে ছিলেন। গ্যেটে তার জীবনের পথ রুদ্ধ করেছেন এ ছিল শিলেরের মনোভাব। নিজে অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। সুতরাং রাজকীয় কাজ করে গ্যেটে যে মোটা পারিশ্রমিক পান তা তার অসুয়ার কারণ হয়েছিল এবং এত টাকার বিনিময়ে গ্যেটের রাজকীয় কাজ অন্য লোকে করে দেয় এবং তিনি রাজকীয় কাজ খুব কম করেন এই ছিল শিলেরের মনোভাব।

গ্যেটে নিজেই জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিলেরের যাতে নিয়োগ হয় তার চেষ্টা করে অধ্যাপনা কাজে বহাল করেন। কোন রকম বিদ্বেষ বা অসূয়া থাকলে গ্যেটে নিশ্চয়ই তাকে সে কাজে নিয়োগ করতেন না। গ্যেটের চরিত্রের মহত্ত্ব এ কাজে বেশ বোঝা যায়। এই সময় গ্যেটের চিত্রণ শিলের এই বলে করেছেন যে, গ্যেটের মুখের হাবভাব খোলাখুলি না। তবু চোখের ভাষা মনোরম ও প্রকাশধর্মী। ব্যবহার তার নম্র ও কোমল তবে গ্যেটে বেশ গম্ভীর। মাথার বাদামী চুল দেখে গ্যেটেকে পরিণত বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। গলার সুর মধুর। নদীর স্রোতের মত বহমান। মনের ভাব যখন গ্যেটের ভাল থাকে তখন কথা বার্তা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। তার প্রতিটী কথা বহু লোক মনে গেঁথে রাখতে চায়। ইটালী ভ্রমণ শেষ করে সবে এসেছেন সুতরাং সে-দেশের কথা তিনি বলতেন। ইটালীয়ানদের দোষগুণে যে ইন্দ্রিয়জ বাসনা থেকে উৎপত্তি এ-কথা বলতেন। ইটালীন শিশু, কুমারী নারী ও বিবাহিত নারী বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতেন।

যার বিষয়ে তিনি কথা বলতেন। সেই ভদ্রমহিলাকে হারিয়ে বর্ত্তমানে গ্যেটে দুঃখ অনুভব করছেন। তারকাছ থেকে আরও জানা গেল রোমের কুমারী মেয়েরা বিবাহিত নারীদের চেয়ে সৎ এবং পাঁচ বছরের ছেলেরাও পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে। গ্যেটের ওপর তার যা ধারণা ছিল ব্যক্তিগত পরিচয়ের পর সে ধারণার স্থলন হয় নি। শিলের আশঙ্কা করেছিলেন তাদের মধ্যে যদিও মিল আছে তবু পরিচয় পরস্পরের গভীর ও আন্তরিক হবে না। গ্যেটে বয়সে প্রধান। শিলেরের চেয়ে দশ বছরের বড়, সুতরাং জীবনের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। গ্যেটে নিজেকে কর্মধার দ্বারা অনুশীলন করে তৈরী করেছেন—যা শিলেরও জীবনের গতাগতির পথে আহরণ করতে পারবেন না। শিলেরের জীবনে বাধা বিপত্তি ছিল বহু, তার জীবন বিরোধে ও বিপক্ষে কেটেছে। গ্যেটের জগৎ ও তার জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। গ্যায়েটের জগৎ তার জগৎ নয়। সুতরাং জীবন দর্শনের প্রতিটি স্তরে তাদের পার্থক্য। গ্যেটের সঙ্গ শিলেরের প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয় নি। কারণ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে গ্যেটে উষ্মাসিক ব্যবহার করতেন। এই নিস্পৃহ ভাব শিলের লক্ষ্য করেন। কোন কিছু গ্যেটেকে আনন্দ বা অভিভূত করতে পারত না। গ্যেটেকে একজন অহং সর্বস্ব পুরুষ বলে শিলেরের মনে হয়। লোককে যে গ্যেটে নিজের মুঠির মধ্যে আনতে পারেন, এ শিলের লক্ষ্য করেন। তা ছাড়া বিনয় প্রদর্শন করেও লোককে তিনি জয় করতে পারেন। তা ছাড়া দয়া দান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেও লোককে

তিনি জয় কর্তে পারেন। তা ছাড়া দয়া দান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তার যে একটা বিশিষ্ট রূপ আছে তা গৌণ ভাবে গ্যেটে প্রকাশ করেন। শিলের এ-ভাবকে স্বার্থপরতা বলেছেন। এ স্বার্থপরতা ভগবানের মত—ভগবান দান করেন কিন্তু নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে দান করেন না। গ্যেটের দান ঠিক এই রকম। সব দেন তিনি—নিজেকে নিঃশেষে দান করেন না। এ রকম লোকের সাযুক্ত কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না। এই কারণে শিলের গ্যেটেকে ঘৃণা করেন। তবুও তার মনও জগতকে শিলের সম্মান দেন। গ্যেটের মধ্যে কৃত্রিম লাজুক "নারী" সত্তার অস্তিত্ব শিলের সম্ভবতঃ সব প্রথম দেখতে পান। গ্যেটেকে দেখে শিলেরের জিঘাংসা জাগে আবার ভালবাসার উদ্রেক হয়। তার মনোভাব ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের মত-যা তারা জুলিয়াস সীজারকে দেখে প্রকাশ করতেন। এই কারণে গ্যেটের ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে আবার তাকে ভালবাসতে চান। গ্যায়েটের নাম যশ ও পদমর্য্যাদা দেখে তার অসূয়ার ভাব মোটেই অস্বাভাবিক নয় কারণ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাকে লড়াই করে অসুস্থ শরীর নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে হচ্ছিল। প্রথম পরিচয়ে শিলের ভাবেন যে গ্যেটের দৃষ্টি বাইরের জগতের স্থূল বস্তুর ওপর নিবদ্ধ।

যা হোক তাদের আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। শিলেরের বাসনা ছিল এই যে যে-ফল গ্যেটে অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করেছেন তার রূপ গ্যেটে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। গ্যেটে নানা ভাব ও অনুভূতিকে ব্যক্তি জীবনে কর্ষণা করেছেন। এখন সে-সব সামগ্রী তার জীবনের সোনা-ঝরা গাছে ফলে পরিণত হয়েছে এবং গাছকে নাড়া দিলে অমৃত ফল গ্যেটের হাতে এসে পড়বে। অন্ধকারে গ্যেটে পথভ্রষ্ট হন নি। নতুন কোন কিছুর ওপর গ্যেটে যেন না ঝুঁকে পড়েন এই ছিল শিলেরের ইচ্ছা কারণ নতুন কোন কিছুর অনুশীলন করে গ্যেটে হয় ত আরও অগ্রসর হতে পারবেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞান যদি গ্যেটে কবিতায় প্রয়োগ করেন তা'হলে হৃদয়ের ফসল আরও সতেজ ও সজীব হবে। কবিতার ক্ষেত্রে যে শীর্ষপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন তা শিলের বুঝতে পারেন গ্যেটের হারমান ও ডরোথিয়া পাঠ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে সাধারণ লোকের প্রতি গ্যেটের আস্থা ছিল না। এ তিনি আত্মজীবনীতে ও নানা পত্রে স্বীকার করেছেন। সাধারণ লোক সব কিছু সহজেই সমাধান করবার চেষ্টা করে পথের আশে পাশে কী রয়েছে তা না জেনে। লোকের কেবল অর্থ চেনে। তাদের মনের ভাব অতি সাধারণ—তা কোন লোকের মধ্যে সহজ সঞ্চারিত করা যায় না। সে মনোভাব এমন কিছু মহৎ নয় যা অপর লোকে গ্রহণ করতে পারে। তারা রোমান্স পড়ে। সাময়িক পত্রিকা পাঠ করে। থিয়েটার দেখতে যায়। তার অর্থ কোন কিছু তাদের মন আকৃষ্ট করতে পারে না। এ-সব কাজ তারা করে সব কিছু গভীরকে এড়িয়ে যাবার জন্য। মন তাদের সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। লোকেরা কবিতা পড়ে না—কবিতা পাঠের জন্য যে একাগ্রতা দরকার তা জার্মান জনসাধারণের নাই। শিলেরের কাছে আরও জানান তিনি মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে হলে যে যুগে যে শতাব্দী বাস করতে হয় তাকেও ভুলে যেতে হবে কারণ মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে হলে, পৃথিবীর সর্বকালীন আদর্শকে প্রকাশ করতে হলে দর্শনকে প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিশীলিত করে প্রচার করতে হবে।

খণ্ড খণ্ড অনুভূতির মধ্যে এবং যুক্তির মধ্যে রয়েছে তার কাব্যের সুষমা। এই কাব্যের সুষমার জন্য নির্জনে ক্লাসিক রস দ্বারা নিজের বোধকে পুষ্ট করতেন তিনি। অন্তরঙ্গ বন্ধুর আগমনেও যে তার কাব্যচর্চার বাধা হয় তা গ্যেটে শিলেরের কাছে বলেছেন। এই সময় গ্যেটে শিলারকে আমন্ত্রণ জানান এই বলে যে অভিনেতারা শিলেরকে দেখতে চান। সৌন্দর্যের

অনুভূতি ও প্রয়োগ যে শিলের তার নাটকে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন এ তাদের বিশ্বাস। ভাইমারের মঞ্চ জগতে পরবর্তী যুগে আঙ্গিক রূপ ও বহিরঙ্গ বিষয়ে গোটে প্রধান পরিচালক ছিলেন। শিলের ছিলেন শিল্পী, রঙ্গমঞ্চের তিনি ছিলেন আত্মা আর গোটে ছিলেন মঞ্চের মস্তিষ্ক। আদর্শ ও কল্পনাকে কবিরা রচনার মধ্যে প্রকাশ করুক এই ছিল শিলেরের বাসনা। গোটে অবশ্য আদর্শ ও কল্পনাকে এই জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চান ঘটনার মধ্যে এবং তিনি বিশ্বাস করতেন ঘটনার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ হয়, স্বরূপের উন্মোচন হয়। এই কারণে সাধারণ লোকের সঙ্গে গোটে সাধারণ কথাবার্তা বলতেন। খাপ খাইয়ে নিতেন। শিলেরের ভাব ও কল্পনা অবশ্য তিনি শুদ্ধ সত্তার স্বীকৃতি বলে সংযোজনা করেন। ফাউস্ট নাটকের অনুপ্রেরণা গোটে শিলেরের কাছ থেকে পান কারণ দার্শনিক চিন্তাধারা সে রচনায় প্রথিত। প্রস্তাবনা ও উৎসর্গ অংশ লেখার পর শিলেরকে জানান যে তার এই ভাবনিষ্ঠ রচনা ফাউস্ট লিখতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। এ-বিষয়ে শিলের যেন বিনিদ্র রজনী চিন্তা করে তাকে তার মন্তব্য জানাক এই ছিল গোটের ইচ্ছে। ভাবনিষ্ঠ রচনা লেখবার সময় কুয়াশা আর রহস্যের মধ্যে মাঝে মাঝে গোটে যেই হারিয়ে ফেলেন। গোটে বুঝতে পারেন তিনি এক সাঙ্কেতিক নাটক লিখছেন এবং এই সাঙ্কেতিক নাটক লেখার জন্য কল্পনার অবদান কম নয়। মানুষের হৃন্দ্বের ভিতরে জৈব মানুষ ও পরম মানুষকে তিনি চিহ্নিত করবার প্রয়াস করে ভাবেন, এ মূল আখ্যা নব বস্তুর সঙ্গে সাধারণ লোক কোন সামঞ্জস্যের সূত্র খুজে পাবে না। শিলেরকে আরও জানান যে দর্শন ও কাব্যের রূপ একটা গতিশীল কল্পনাশ্রয়ী রূপের দ্যোতনা সৃষ্টি করবে। শিলেরের কাছে তিনি আরও জানান যে ফাউস্ট নাটক লেখবার জন্য তিনি আনন্দের সঙ্গে সাঙ্কেতিক ও অল্পই পৃথিবীর আদর্শকে বেছে নিলেন।

জীবনের সহজ সরল পথকে যে তিনি দার্শনিক হিসাবে দেখবার শপথ নিলেন। জীবনের নানা ধন যে তার কাছে আরও পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তার কারণ এই যে গোটে তার জ্ঞানের ব্যাপকতা দিয়ে অভিজ্ঞতাগুলোকে মিশ্রিত করে নিয়েছেন। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার রসায়ন হয়েছিল বলে ভাবপ্রবণতাকে গোটে জয় করতে পেরেছিলেন। তবুও তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে বস্তুর মধ্যেও ঘটনার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা তার স্বরূপকে ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল। ভাবপ্রবণ হলেও অবিচলিত হওয়া যায়। কারণ এই অবিচলিত ভাব দিয়ে মানুষ নিজের রাশকে টেনে ধরে; উদ্দেশ্য অভিভূত না হওয়া, কারণ জীবনের যে কোন ঘটনা ও ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ সব অনুভূতিকে সমাক রূপে বুঝতে পারে এবং অহংকার ও গর্বকে জয় করতে পারে। তিনি আরও বুঝতে পারেন যে এক ও সার্বজনীন বিশ্বের সত্তাকে ঘিরে রেখেছে জীবনের নানা সাঙ্কেতিক রূপ। নানা বিচিত্র রূপের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে জীবনের বহুবিধ দ্যোতনা রয়েছে যাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। তবু ভিতরে ও বাহিরে একটা শান্ত রূপ আছে যা বিশ্বের সঙ্গে, এককের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। মানুষের কবিতার উৎস এই সব আদর্শের মধ্যেও সঞ্চারিত। শুধু মাত্র অন্তসারহীন কৃত্রিম ভাবপ্রবণতা দিয়ে জীবনের উচ্চগ্রামে কবিতার মাধ্যমে কেউ উপনীত হতে পারে না। কৃত্রিম ভাবপ্রবণতা শূন্যগর্ভতাকে প্রকাশ করে—এই শূন্যগর্ভতা বস্তুর বাইরের আবরণে থাকে এবং জীবনের শূন্যবোধ যদি কাউকে আকৃষ্ট করে তবে তা হলে রচনার মধ্যে যদি কিছু মহৎ থাকে তা গৌণ হয়ে পড়ে ভিতরের আন্তরিকতার অভাবে, সুন্দর বিধৃত হয় যখন আদর্শ বা কল্পনা সাধারণ রূপের সঙ্গে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। ভিতরের রূপকে জানতে হলে গভীরে প্রবেশ করতে হবেই।

গোটেকে প্রাগুক্ত মন্তব্য করা ছাড়াও শিলের ব্যক্তিগত পত্রে জানাল যে গোটের সঙ্গে তার

যে সব আলোচনা হয়েছে তা তার চিন্তাধারার উৎসগুলোকে আরও গতিদান করেছে। গোটের ধ্যানধারণা তার ওপর একটা প্রভাব এনেছে এবং নতুন দিক ও পথ খুলে দিয়েছে, যার সঙ্গে শিলেরের যথাযথ সম্যক পরিচয় ছিল না। শিলের ছিলেন কল্পনাশ্রয়ী। সুতরাং বাস্তব জগতের বস্তুনিষ্ঠ বহুবিধ চিন্তার কেন্দ্রস্থানগুলির বোধবিষয়ে শিলেরের অভাব ছিল। সেই অভাব গোটে পূরণ করে ছিলেন কারণ গোটের চিন্তাধারা বস্তুকে কেন্দ্র করে এবং বস্তুর ওপর তার চোখ আবদ্ধ। এই বস্তুকে বিচার বিশ্লেষণ করে গোটে সেই বস্তুর মধ্যে হারিয়ে যান নি কারণ এই বস্তুকে অতিক্রম করে তার পরীক্ষা ও নিরীক্ষা আত্মশক্তি নির্ভর প্রজ্ঞায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি এর জন্য প্রয়োজন। অনেকে বিশ্লেষণ করে সব কিছু সহজে বোঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু বুঝতে হলে পূর্ণতার প্রয়োজন যে পূর্ণতা গোটে আহরণ করেছিলেন। এই সব লোক যারা প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে বিচরণ করে তারা নিজেদের পূর্ণতা বিষয়ে অনেক সময় অবহিত থাকেন না কারণ তখন তারা অন্তর্লোকে প্রবেশ করেন তার ফলে নিজের বহিরাবরণকে ভুলে যান। এইসব লোক খুব কম যুক্তি দর্শন শাস্ত্র থেকে আহরণ করে কারণ তারা সত্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হন বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়া ও নিয়মের সঙ্গে।

সারা প্রকৃতির মধ্যে গোটে যে সত্যকে খুজে প্রকৃতির সত্তাকে এক করবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তা শিলের বুঝতে পারেন। এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ কারণ প্রয়োগের দ্বারা নিজের ব্যক্তিমূল্যকে গভীর ভাবে ব্যাখ্যা করা দুর্বল লোকের সম্ভব নয়। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে হৃন্দ্বদ্ব সে হৃন্দ্বদ্ব জটিল আর এই জটিল গ্রন্থিবন্ধনে দুর্বল লোক নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। প্রতি বস্তুকে নতুন করে জেনে জীবনের ব্যাপক পথে মহৎ ও সত্যকল্পনাকে তিনি গ্রথিত করছেন সুন্দরের সঙ্গে। এই সৌন্দর্য অমরতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গোটে যদি গ্রীক অথবা ইটালীয়ান হতেন, তা হলে গোটের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নাই যে গ্রীক ও ইটালীয়ানরা শিল্প ও কলা জগতে এক উন্নত জাতি। জার্মাণ গথিক গাথুনির সঙ্গে জার্মানীর পণ্ডিত প্রতিভা সব কিছু গ্রহণ করে বাস্তব সত্যের অভাববোধকে নিজের প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজেকে তিনি পরিশীলিত করেছেন। বস্তুকে ছাড়িয়ে বস্তুর ওপরে নিজেকে বিকাশ করছেন তিনি। জীবনের অপর্যাপ্ত রূপকে, নিম্ন প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করতে হয়েছে তাকে। এগুলো তার কল্পনাকে ব্যাহত করেছিল। সহজ জ্ঞান ও অখণ্ডবোধ থেকে জীবনের দুই প্রান্তিক চিন্তাধারা হৃন্দ্বদ্বের ভিতর দিয়ে গিয়ে দর্শন ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সুন্দরের স্তরে উপনীত হয়। অভিজ্ঞতা ও সহজজ্ঞান ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্লেষণ করা মন একাধিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার রসায়ন মানুষকে উচ্চগ্রামে নিয়ে যায় এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ একাধিক রূপে প্রকাশ করে। জীবনের স্থিতি ও বাস্তব বস্তুর প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক মেনে নিয়ে। তর্কনিষ্ঠ মন শেষে হৃন্দ্বদ্বের ভিতর দিয়ে গিয়ে জ্ঞানে এবং জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞায় উপনীত হয় এবং জ্ঞানে লোকে পৌছায় ঘটনার বিম্ব প্রতিবিম্ব থেকে।

শিলের ছিলেন কল্পনাবাদী। নভচারী ছিল তার মন। জার্মানীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল হয়। বস্তুর অভিজ্ঞতার মূল্যের প্রতি গোটের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিটোফেন ছিলেন নভচারী কল্পনাবাদী। সেই কল্পনাকে সেই যুগে মোজার্ট জীবনের গ্রামেবেঁধে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে রূপ দেবার প্রয়াস করেন। কাব্যের ক্ষেত্রে জীবনের রূপকে গোটে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনের রূপ দেন। শিলের পৃথিবীর কল্পনাস্তরে চলতেন। গোটে বন্ধুকে বস্তুনিষ্ঠ হতে বলেন এবং শিলেরের নভচারী মন অনেকটা ভাববাদ কাটিয়ে ওঠে। সঙ্গীত জগতে কল্পনা ও বাস্তবের পরিপূরক ছিলেন বিটো-

ফেন ও মোজার্ট আর কাব্য জগতে কল্পনা ও বাস্তবের পরিপূরক ছিলেন শিলের ও গ্যেটে। এই সময় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জার্মানীর স্বর্ণযুগ চলছে। জার্মানীর সঙ্গীত ও সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও সমালোচনার ক্ষেত্রে শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয় আবির্ভূত হচ্ছেন। কাণ্টের দর্শন আলোচনার ওপর ভিত্তি করে ফিক্টে এই দর্শনকে ভিন্নভাবে রূপ দেন। তারপর সেলিং, হেগেল ও সোপেনহাওয়ার হাতে পড়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই সময় জার্মানীর সাহিত্য জগতে ক্লাসিকাল ও রোমাণ্টিক ধ্যানধারণার দ্বন্দ্ব চলে।

শিলেরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ক্লাসিকাল যুগের শেষ হয়। ১৮০৫ সালে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরে শিলেরের মৃত্যু হয়। শরীর তার ভগ্ন ছিল কিন্তু তার উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল না। দুই বন্ধুর এক সঙ্গে কঠিন অসুখ হয়। মার্চ মাসের শেষে শিলেরের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে নামে। শিলেরের আশা অনেকেই ছেড়ে দিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে পত্রালাপ চলত নিয়মিত। মে মাসের প্রথমে গ্যেটে সুস্থ অনুভব করে দৈহিক যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে শিলেরের কাছে যান। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন শিলেরের গৃহে; সে সময়ে শিলের থিয়েটারে যাচ্ছিলেন। গ্যেটের দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্য শিলেরের সংবাদ জানান হত না। অভিনয় দেখবার সময় শিলের অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৯ই মে ১৮০৫ সালে শিলের মারা যান। শিলেরের মৃত্যুর সংবাদ তার অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্যেটেকে বলতে পারলেন না। গ্যেটের মনে সন্দেহ হয়। রাতে গ্যেটেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শোনা গিয়েছিল। অবশেষে গ্যেটে পত্নীকে শিলের বিষয়ে প্রশ্ন করেন এই বলে যে শিলের অসুস্থ কেমন রয়েছে সে। পত্নী কান্নায় ভেঙে পড়ে নগ্ন সত্য জানালেন। নিয়তির শক্তি যে প্রবল তা গ্যেটে বুঝলেন। জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ মুহূর্ত তার সেই ক্ষণটী ছিল। এরপর তার সামনে বেশ কয়েক দিনের জন্য শিলেরের নাম উচ্চারণ করতে পারত না। এরপর গ্যেটের স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়ে। সুস্থ হয়ে উঠে শিলেরের অসমাপ্ত রচনার পূর্ণ রূপ দেওয়ার সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। নাটক পড়েন আর নাটকের মধ্যে মজার চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে শিলেরকে আরও তিনি ভুলতে পারেন না। শিলেরের মৃত্যু হয়েছে ভাবলেই তিনি নিজেকে অসহায় ভাবেন, মনে হয় তিনি ধূলোর সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। কবির দেহ অসুস্থ। কাজের ক্ষমতা কমে গেল। তার মন শূন্য। যে কাজ না করলে নয় সেই কাজ করতেন। তবু তার মনে হত তিনি কাজ করছেন না কাজ তাকে কাজ করাচ্ছে। ডায়রীর শূন্য সাদা পাতাগুলো তার মনের শূন্যতার পরিচয় দেয়। ডায়রীও তিনি লিখতেন না। কোন পরম বন্ধু ভাইমারে গিয়ে যদি স্মৃতি-সৌধ না দেখত তা হলে তিনি মনে মনে হাসতেন। গ্যেটের মৃত্যুদিনে শিলেরের কথা মনে পড়ে; একটা কাগজ উড়ে পড়েছিল সেদিন তা দেখে বলেছিলেন শিলেরের চিঠি এত অযত্ন করে রাখা হয় কেন। বন্ধুর স্মৃতি সৌধের পাশে তার কবর দেওয়া হয়। শিলেরের জীবনী যখন কার্লাইল লেখেন তখন তাকে উৎসাহ দেন। মৃত্যুতে দুই বন্ধুর পরম মিল হয়।

চাবি

রবীন্দ্র সেনগুপ্ত

সুরভি বাপের বাড়ি এসেছে। ছোট বোন করবীর বিয়ে, সেই উপলক্ষে। সঙ্গে এসেছে শাড়ি ব্লাউস্ ভর্তি দুটো ট্রাঙ্ক, এক সেট আলাদা বিছানা, টয়লেটের জন্যে একটা ছোট এ্যাটাচি, একটা ক্যাশ-বাক্স—চাস বোঝাই শুধু গয়না আর টাকায়, আর ছোট একটা ট্যালবট গাড়ি। কড়া ধাঁচের মানুষ রজত; তায় মস্ত বড়লোক। তবুও সুরভির প্রতি কঠিন নির্দেশ আছে, যেন এটুকুর বাইরে তার বিলাস না ছড়ায় এবং রজতের এই যৎসামান্য ঐশ্বর্য প্রচারে সুরভির তরফ থেকে যেন কৃপণতা না প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, নির্দেশ যত কঠিনই হ'ক না কেন, সুরভিকে তা মানতেই হবে। সুতরাং পিত্রালয়ে আসার পূর্বে সে যথাসাধ্য স্বামীকে নিশ্চিন্ত করে তবে আসতে পেরেছে। সুরভি জানে, সুরেশ্বরবাবু যেমন আয়োজনই করুন না কেন, যত অলোকিকই হ'ক না কেন তাঁর ব্যবস্থা, রজতকে যথারীতি নিশ্চিন্ত করতে না পারলে, সে অনায়াসেই এ উৎসব থেকে বাদ পড়ে যেত, এবং এ ঘটনাটা নিয়ে রজতের মনে কোন চিন্তবিকার ঘটত না।

কিন্তু এসে অব্দি তার স্বস্তি নেই। কখন, কি ভাবে এবং কোথায় যে সে চাবির থলোটা হারিয়ে ফেলেছে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। রজত সম্পর্কে সে চিরদিনই সচেতন; তবুও অকস্মাৎ কিছু চেনা মুখ আর পরিচিত কলহাস্যের মধ্যে সাময়িক ভাবেই কিছুটা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, এবং সেই সময়টুকুর মধ্যেই ঘটেছে এই বিপর্যয়। তারপর যথাসাধ্য গোপন রেখে সে আতি-পাতি করে খুঁজেছে সর্বত্র, কিন্তু হারানো চাবির সন্ধান পায় নি। ইতিমধ্যে একটু একটু করে সবাই জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা। বিয়ের কনে করবী জেনেছে—অনেক ব্যস্ততা সত্বেও সুরেশ্বরবাবুর কপালে চিন্তার রেখা প্রকট হয়েছে—উৎসবমুখর বাড়িটার প্রতি আনাচে-কানাচে একটা থরথর আতঙ্ক সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সন্ত্রস্ত করেছে। তারপর আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে যখন অনাবশ্যক ব্যস্ততায় ঘর-দোর-বার করেছে চাবির সন্ধানে, তখন পায়ে পায়ে চারতলার নিরিবিলি সান্নিধ্যে সে পালিয়ে এসেছে শান্তি পেতে।

ভেতর বাড়ির তিনতলা অব্দি মানুষ-জনের সমাগম। চারতলায় শুধু ছাদ—সঙ্গিহীন, একান্ত স্তব্ধ। এই অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি পরিবেশে সুরভি নিশ্চিন্ত হয়ে মাথার কাপড় খুলে দাঁড়াল। ভারি জর্জেটটা গায়ে বসে না—শালীনতা বজায় রাখতে মুহুর্মুহু দৃঢ় করক্ষেপ করতে হয়। উপস্থিত তার প্রয়োজন নেই। সুতরাং অনেকটা আশ্বস্ত ও নিশ্চিত হয়েই সে দাঁড়িয়ে রইল।

করবীর বিয়ে সন্ধ্যালগ্নে। সানাই বাজছে। এখুনি বর এল। সামনের মিত্তিরদের বাড়ির চারতলার ছাদ জুড়ে সামিয়ানা। লোকজন, ব্যস্ততা সব সেখানেই। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে টুকরো টুকরো ভাবে অনেক কথাই তার মনে পড়তে লাগল। বিশেষ তার বিয়ের দিনটির কথা। রজত এসেছিল যেন বিয়ে করতে নয়—রাজজয় করতে আর তাকে হরণ করতে। বাঁকা একটু হাসল সুরভি। রজতের সেই দম্ভ আজ তার মধ্যেও সঞ্চারিত।

ফুর ফুর করে ফাল্গুনের মদির বাতাস তার অসাবধান অঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাথাটা তুলে ধরল সে। সারাক্ষণ টিপ্ টিপ্ করেছে মাথাটা—ক্লান্তি আর অবসাদে। এখন আবার শুরু হয়েছে চাবি হারানোর দুশ্চিন্তা। হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে। অকারণে নিজেকে দোষা-

রোপ করল। কেন এত দুশ্চিন্তা! রজত সম্পর্কে তার কিসের এত আতঙ্ক! রজত আর তার মধ্যে যে ভালবাসা তার মূল্যায়ন ধনসম্পদের হিসেবে নয়। সে চায় না এই ঐশ্বর্য—চায় না আত্মবিক্রিত হয়ে রজতের পাশে ক্ষুধিতের দীনতা নিয়ে দাঁড়াতে। এইটুকুই তার বিশ্বাস—মনুষ্যত্বের সম্পদ। তবুও শান্ত হ'ল না সে। মনে হ'ল নিচে নেমে আর একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।

। দঐণ শছয়হকম ুএপদদসযফ

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই নকাকীর সঙ্গে দেখা হ'ল তার।

নকাকী ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সুরভিকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। সুরভি না! ছাদে গিয়েছিলে নাকি?

একটু লজ্জিত হ'ল সুরভি। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল—জান কাকী আমার আঁচলের চাবিটা হারিয়ে গেছে?

জানি, কিন্তু কেমন করে হারালি বল্ তো?

বারে! আমি হারাতে যাব কেন? তবে আমার মনে হয় ওপরে দীপুদার ঘরে কাপড় ছাড়তে গিয়েছিলুম—সেখানেই চাবিটা ফেলে এসেছি।

নকাকী এবার হেসে ফেললেন—

—দেখিনি এখনো? শিগগির যা তাহলে! এখুনি ত' আবার জামাই এসে পড়বে।

ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল সুরভির। বলল—কি হবে তাতে! আমি তো তার টাকাকড়ির জিম্মাদার নই যে হিসেব দোব।

হাসিটা আরও একটু বড় করে নকাকী বললেন—তবুও তোর সংসার—হিসেব আর কারো কাছে না দিস, নিজের কাছে তো দিবি?

কথাটা বলে ন'কাকী চলে যাচ্ছিলেন। সুরভি ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

চললে ন'কাকী? আমি কি করব বলে গেলে না?

নকাকী ফিরে এলেন। তারপর সুরভির চিবুকটা একটু নাড়িয়ে বললেন—যা, দীপকের ঘরে গিয়ে দেখ্, চাবিটা পাস কি না। কিন্তু ঘর তো তালা দেওয়া। তোমার কাছে চাবি আছে? নকাকী একটু চিন্তিত হলেন—

তবে তো মুশকিল। কোথায় খুঁজে পাবি তাকে?

তোমার আঁচলে অতগুলো চাবি কিসের?

ন'কাকী আঁচলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—এ চাবি দুটো অমরেশের। আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে।

—অমরেশদা বুঝি থাকতে পারলেন না?

ন'কাকীর তাড়া আছে। কাজের বাড়ি। তবুও সুরভির দিকে স্পষ্ট করে চেয়ে স্বর আর্দ্র করে বললেন—এত করে বললুম, অন্তত দুটো দিন সবুর করে যাবার জন্যে। কিছুতেই শুনল না। কী যে তার কাজ। তোর কথাও বলেছিলুম তাকে।

সুরভি যেন হঠাৎ উসকে উঠল। প্রচণ্ড ইচ্ছা হ'ল জেনে নেয় তার সম্বন্ধে কি বলেছে অমরেশ। কিন্তু তা পারল না। আর পারল না বলেই খানিকটা কঠিন হয়ে বলল—কি দরকার ছিল তোমার? ওসব কাজ-টাজ বাজে কথা। আসলে ঝামেলা এড়াতে চায়।

ন'কাকী একটু অবাক হয়ে বললেন—তা হবে। আচ্ছা আমি চলি। বুঝলি।

নকাকী এগিয়ে গেলেন। সুরভি একটু যেন ইতস্তত করল। তারপর ছুটে ন'কাকীর কাছে গিয়ে বলল—ওই চাবি দুটোই দাও। হাসবার একটু চেষ্টা করল সুরভি। বলল—বলা তো

যায় না, দুজনে যখন বন্ধু, তখন এর চাবি ওর কাছে, ওর চাবি এর কাছে থাকতেও পারে। দেখি না একবার চেষ্টা করে।

চাবি দুটো নিয়ে সুরভি আর দাঁড়াল না। দৌড়োল সিঁড়ির দিকে। ন'কাকী খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে একটু হাসলেন। কি ভাবলেন কে জানে। চেঁচিয়ে বললেন—অমরেশের চাবিটা আবার হারিয়ে বসিস না। আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে বেচারি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুরভি বলল আমার চাবি না পেলে, এটিও পাচ্ছো না মনে থাকে যেন।

সিঁড়ির কোণেই অমরেশের ঘর। কাছ বরাবর এসেই সুরভির সব ব্যস্ততা অকস্মাৎ যেন থমকে গেল। তালাবন্ধ ঘরটার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল সে। হাতে তার চাবির রিঙ্। অমরেশের একান্ত ঘরে প্রবেশের অনুমোদন পত্র। ইচ্ছে করলেই সে ঢুকতে পারে। কিন্তু ঢুকবে না। কারণ এটা তার অনধিকার। অথচ এসেছে সে এখানেই। অমরেশের ঘরের চাবি দিয়ে দীপুদার ঘর খোলার উদ্দেশ্য তার নয়। সে এসেছে অমরেশেরই ঘর খুলতে।

চুপ করে আরও কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মনস্থির করে ঘরের তালা খুলে ফেলল। সামান্য একটা শব্দ হ'ল সঙ্গে সঙ্গে, তারপর অল্প একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল সম্পূর্ণ। একরাশ অন্ধকার। কিন্তু খুব অসুবিধে হচ্ছিল না সুরভির। অত্যন্ত চেনা ঘর যে! একদিন ত' কত বিলম্বিত মুহূর্ত কাটিয়ে গেছে সে এখানে। সুতরাং আলো জ্বালল না। শুধু মনে মনে হিসাব করে নিল কোথায় কি থাকতে পারে। তারপর আলো জ্বালবে আর মিলিয়ে দেখবে মনের হিসাবটার সঙ্গে।

দৈর্ঘে বারো হাত, প্রস্থে দশ হাত হ'ল ঘরের আয়তন। ছোটই বলতে হবে। পুব আর দক্ষিণ দিকে দুটো জানলা। পশ্চিম দিকে দরজা। পুব দিকের জানলাটার কাছ বরাবর ছোট্ট একটা চৌকি—আড়াআড়ি পাতা। দক্ষিণ দিকের জানলাটার মুখোমুখি একটা টেবিল ও একটা চেয়ার—লেখা পড়ার। পুরো উত্তরদিকটা চাপা। সেখানে একটা বইয়ের শেলফ্—একটা কাপড়, জামার আলনা, একটি ছোট সুটকেশ। আর চারদিকের দেওয়াল জুড়ে নিশ্চয়ই টাঙানো ছবির রাশ। সব আলোকচিত্র—অমরেশের তোলা। অমরেশ ফোটোগ্রাফার।

বেশ লাগছিল ভাবতে। মিষ্টি একটা স্মৃতি মন্থনের উত্তেজনা। তবুও অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকায় যে অস্বস্তি তাতে যেন অপরাধের ছোঁয়া আছে। তাই অভ্যাস মত ডানহাতটা বাড়িয়ে সে সুইচ্‌বোর্ডে হাত দিল। সুইচ্ টিপে সামনে তাকাতেই চমকে উঠল সুরভি। চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে কিন্তু পরক্ষণেই সে ভুল বুঝতে পারল। সামনের দেয়ালেই টাঙানো একটা আয়না। সেখানে আপন আকৃতির প্রতিফলন দেখে সে চমকে উঠেছিল।

আগে এটা ছিল না। হয়ত সম্প্রতি আনিয়েছে অমরেশ। কিন্তু এমন বিশ্রী জায়গায় কেউ আয়না রাখে! এ ব্যবস্থা সুরভির মনোমত নয়। খানিক সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। দৃষ্টি তার কৌতুকের। আপন রূপ-সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে যে অচেতন তা নয়। বড়মানুষের ঘরণী সে। প্রতিক্ষণ-মুহূর্তের রূপসজ্জার নিপুন পরিবর্তন সে মনযোগী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করে। তাছাড়া আছে অগণিত পুরুষস্তাবকের রূপ-পাগল চোখ। তার সৌন্দর্য-সজ্জার সবটুকু অনুভূতি সে আহরণ করে এইভাবেই। তবুও আয়নায় নিজের আকৃতি খুঁটিয়ে দেখতে তার ভাল লাগল। কিন্তু দেখতে দেখতে অকস্মাৎ তার মনে হল অনেক বদলে গেছে সে।

এ বিশ্বাস তার দৃঢ় হল ওপর দিকে তাকিয়ে। আয়নার ঠিক ওপরেই ফ্রেমে আঁটা সুরভির উনিশ বছরের একটা বসটু। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে দর্পণে যখন নিজের

প্রতিবিম্ব দেখল, তখন মনে হল ঠিক এই মুহূর্তে অমরেশের ঘরে বিনানুমোদনে প্রবেশের অধিকার তার নেই। সে যেন আজ অপরিচিতা। আজ তার মেদবহুল শরীরাংশের যতটুকু অংশ দৃশ্যমান, সেখানেই ঐশ্বর্যের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা। সারা বাহু, কণ্ঠ সোনার গয়নায় ঠাসা। তবুও যেন তার স্বর্ণক্ষুধার অন্ত নেই। তাই সোনার গয়নার বাক্সর চাবি খুঁজতে সে ক্ষ্যাপার মত ঘরে বেড়াচ্ছে।

সুরভি যেন হঠাৎ রেগে উঠল। তার মনে হল এ-সব ষড়যন্ত্র—হীন যোগসাজস। অমরেশ জানত, সে একদিন আসবে। তাই অমন করে তার পুরোনো ছবিটা টাঙিয়ে রেখেছে। কিন্তু কিসের দাবীতে? সুতরাং অনায়াসেই সুরভি ফ্রেমে আঁটা প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে খুব নির্মম অথচ সূক্ষ্ম একটু হাসল। যার মর্মগত অর্থ বোধহয়—ওহে পটসুন্দরী! তোমার বয়সে তুমি সত্য, আমার বয়সে আমি। স্বামী সোহাগের স্পর্শ, ঐশ্বর্যের নেশা, দম্ভ করার মাদকতা এ-সব মিলিয়েই আজকের আমি। তোমাতে, আমাতে প্রভেদ অনেক।

আপন মনে এ সমর্থনটুকু তৈরি করতে বিশেষ বিলম্ব হল না সুরভির; এবং এটুকু মীমাংসা বোধের উৎসাহ থেকেই যে অকারণ খানিকটা খুসীও হয়ে উঠল। চাবির রিঙটা দোলাতে দোলাতে সে পুলকাধিক্যে ইতস্তত দৃষ্টি ফেলতে লাগল। উত্তর দিকের দেয়ালের মাঝ বরাবর ন'কাকীর একটা বড় ছবি। সন্ধ্যায় নীড়গত বিহঙ্গের ম্লানায়মান দুটি চোখের মত ক্লান্ত ধূসর সে দৃষ্টি। চোখের ভাষা যে এত ব্যঞ্জনাময় এই প্রথম অনুভব করল সুরভি। বেদনার্ত দুটি চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গভীর একটা নিঃশ্বাস পড়ল তার। বেশ সুন্দরী ছিলেন ন'কাকী; এবং আজও হয়ত সে রূপের ভাঙাচোরা অবশিষ্ট খুঁজলেই পাওয়া যায়। কিন্তু এমনিতে এই হাসিখুসী অন্তরটির পাকে পাকে এত বিষাদব্যথা, এ ছবি না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না সুরভির। ন'কাকার ছন্নছাড়া জীবনযাত্রা আর তাঁর তামসিক চরিত্রটা যেন গা-সহা হ'য়ে গিয়েছিল এ বাড়ির সকলের খানিকটা প্রথাবদ্ধ কালের দিনরাত্রির অনুবর্তনে আর সম্ভবত ন'কাকীর মধুর স্বভাবের চর্চায়। অমরেশের তোলা এ ছবিটা দেখে হঠাৎ তার মনে হল, এই আত্মসর্বস্ব পরিবারের, অগনিত স্বার্থ-'দ্বন্দ্ব' ভোগসুখ কাড়াকাড়ির মাঝখানে ন'কাকীই সম্পূর্ণ আলাদা আর একান্ত আপন। কিন্তু এ উৎঘাটনের সমস্ত কৃতিত্ব অমরেশের, তাই মনে মনে প্রশংসার ডালি অমরেশের পায়েই সমর্পন করল সুরভি।

অমরেশ সম্বন্ধে তার এটুকু দাক্ষিণ্য বোধ যেন তাকে অনেকখানি সহজ করে দিল। তাই অনায়াসেই সে এটা-ওটা দেখল, এদিক ওদিক জিনিষপত্তর, কাপড়জামা ঘাঁটাঘাঁটি করল, তারপর একটা অসতর্ক মুহূর্তে চাবি দিয়ে টেবিলের টানাটা খুলে ফেলল। যেন এটা তার সঙ্কোচহীন অধিকার। ঘরে ঢুকে মনে হয়েছিল উনিশ বছরের সুরভি, যেন আজকের সুরভিকে ধিক্কার দিচ্ছে। তার মরা চোখের হিমশীতল চাউনিতে কি তীব্র ঘৃণা! সুরভি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন সে সহজ, অত্যন্ত সহজ, পুরোপুরি নির্দ্বন্দ্ব। ফ্রেমে আঁটা ছবিটার দিকে চেয়ে মুচকি একটু হেসে সে খুব সহজ ভাবেই টানা থেকে কাগজপত্তর বের করে ঘাঁটতে শুরু করল।

আজে-বাজে কাগজপত্তরের সংখ্যাই বেশি। লোকটার চিন্তাধারায় যেমন এক অস্বচ্ছ জটিলতা তেমনি কি স্বভাবেও! এত সব অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল এমনভাবে কেউ জমিয়ে রাখে না। ভালই হ'ল ঘরটা খুলে। আজ সে নিপুন হাতে সব পরিস্কার করে যাবে। রাখবে শুধু প্রয়োজনীয় কটা জিনিষ, আর বাকি সব ফেলে দেবে। অমরেশ শুধু অবাক হবে এই পরিবর্তন দেখে, কিন্তু কিছুতেই অনুমান করতে পারবে না। মনে মনে এটুকু আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সুরভি আরও খানিকটা সহজ হল। পাঁচ বছর আগে আঁচল উড়িয়ে, চোখে মুখে প্রগলভতা

নিয়ে সে যেমন এসে অমরেশের সব কিছুর ওপর অধিকার দাবী করে বসত, ঠিক তেমনি একটা অনুভূতি সে আজও পেল। অমরেশ সেখানে উপস্থিত না থাকলেও, সে ধরে নিল দীর্ঘ পাঁচ বছরেও অমরেশের চরিত্রে কোন দৃঢ়তাই আসে নি। অত্যন্ত পলকা একটা পরিচয়ের সূত্র ধরে সে বাড়িতে এসেছিল আশ্রিত হয়ে অনেককাল আগে। তারপর ত' কত বছর কেটে গেছে, কিন্তু কই, অমরেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ বাড়ির কোথাও ত' কোন সচেতনতা দেখলে না সুরভি! শুধু সে যে এ পরিবারের অন্যতম, এটুকু জানা যায় ন'কাকীর চোখ মুখ থেকে। অমরেশের সৌভাগ্য তাঁর স্নেহচ্ছায়ার স্পর্শ সে পেয়েছে। আর পেয়েছে সুরভি—ছি! ছি! এসব কি ভাবছে সুরভি। নিজেকে অকারণ শাসন করল সে। তারপর শুরু করল কাগজগুলো বাছতে। খানিক পরে হাতে ঠেকল একটা ফাইল—চিঠির ফাইল। চিঠি জমানো অমরেশের একটা পুরোনো অভ্যাস। দুটো-একটা ওপর ওপর পড়ল সে। তেমন ভাল লাগল না। নেহাৎই ব্যক্তিগত এবং প্রয়োজনীয়। অকস্মাৎ একটা অদ্ভুত লজ্জা যেন তার সমস্ত চেতনায় জড়িয়ে ধরল। পাঁচ বছর আগে, সে যখন হোস্টেলে, তখন ত' কম চিঠি লেখে নি সে অমরেশকে। অমরেশ কি আজও সেগুলো রেখেছে! সুরভি ভাবল, যদি রেখে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সে কৈফিয়ৎ দাবী করবে অমরেশের কাছে। একখানা করে চিঠি বাছতে লাগল সুরভি। কিন্তু তার লেখা একটা চিঠিও পেল না সে। একটু আগে অমরেশের কাছে কৈফিয়ত দাবী করবে বলে মন স্থির করেছিল। কিন্তু এখন সে কোন মুখে তার কাছে দাঁড়াবে! তার লেখা একটা চিঠিও নিজের কাছে রাখা প্রয়োজন মনে করে নি অমরেশ। এ তার ভীষণ লজ্জা, অত্যন্ত অপমান। নিজের মনে এতক্ষণ ধরে যে মিথ্যা সাহস আর দম্ভ রচনা করেছিল সে, এক মুহূর্তে তা যেন মিলিয়ে গেল। মনে হল টেনে ছিঁড়ে দেয় তার ওই উনিশ বছরের বস্টটা কিংবা টান মেরে ফেলে দেয় চিঠির গোছা। অপমানের সুতীব্র দহন জ্বলায় একরকম অস্থির হয়েই সে ডালাটা বন্ধ করল, তারপর বিশৃঙ্খল উত্তেজনায় ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবেগে।

ক্যাশ-বাক্সর চাবি হারায় নি সুরভি। নিজের বাড়িতেই ফেলে এসেছিল ভুল করে। শ্বশুর সুরেশ্বরকে হাসতে হাসতে বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে রজতই এ ঘটনাটা বলেছিল। সুরেশ্বর স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন সত্যি; বড় অসাবধান সুরভি।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

তরঙ্গিনী অসহায়। মৃগনয়নী আজ বোঝেনি, পরে বুঝেছিল। মনের দৌরাত্মে আর অসংযত আব্দারে বিভ্রান্ত হয়েছিল তরঙ্গিনী। কেন হয়েছিল এ প্রশ্নও মূর্খামী। সংসারে অনেক কিছু হয়, হতে হয় বলেই হয়, কেন হয় তার জবাব মেলে না।

আজ রাত্রে মৃগনয়নী সইতে পারছে না তরঙ্গিনীর এই উগ্ররূপ। সত্যও মরবে। ওর বরকে ও মেরেছে। সত্যকে মারবে। ওর আগুনের মত রূপে কত পুরুষ যে দগ্ধ হয়ে নিশ্চিহ্ন হবে কে জানে? অমাবস্যার অন্ধকার আলকাতরার মত চুইয়ে পড়ছে। পায়ের নীচে মাটি দেখা যায় না। সামনের কামরাঙা গাছটাকে মনে হয় দৈত্যের মত।

আর সাড়া শব্দ নেই। মৃগনয়নী আস্তে আস্তে ঘরের পিছন থেকে সরে আসে। ইঁদারায় গিয়ে আঁচিয়ে গুটিগুটি চলে আসে নিজের ঘরে। দিদির ওপর এক বিষাক্ত ঘৃণা বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। ছেলে তখনও নিরুদ্বেগে ঘুমোচ্ছে। ছেলের কাছে গিয়ে শোয়।

পুঁটি ততক্ষণে এসে শুয়েছে। ওকে দেখে বলে,—কিলো, আঁচাতে এত দেরী?

মৃগনয়নী ছেলের কাঁথাটা পাল্টে দেয় নীরবে।

—কোথায় ছিলি?

মিথ্যে বলবে, না বলে দেবে সব কথা পুঁটিদিকে? বলবে সব কথা কর্তামাকে, মাকে? বলতেও যেন গলা ধরে আসছে।

—কতক্ষণ এসে শুয়ে আছি। তোকে ত' খুঁজেও এলুম পুকুর ধারে আঁচাতে গিয়ে।

—পুকুর ধারে ছিলুম না।

—কোথায়।

—ইঁদারার ধারে।

—এত দেরী ওখানে?

—বেশ লাগছিল। অন্ধকারে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ভালই লাগে।

পুঁটি হাসে—তোর কি মাথা খারাপ নাকি? অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে থাকা। রক্ষে করো বাবা! ভয়ে হাতপা গুটিয়ে আসবে আমার।

মৃগনয়নীও হাসে,—তোর মত অমন আলগা ভয় আমার নেই! বলল একাএকা কালী-বাড়ী থেকে ঘুরে আসতে পারি।

পুঁটি হেসে ওঠে,—বলিস কিরে! দশটাকা দিলেও আমি ওই চাঁপা ঝোঁপের পাশ দিয়ে যেতে পারব না। আর ওই পাঁচীলটা?

মৃগনয়নী হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে। পুঁটি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। মৃগনয়নী মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে তরঙ্গিনীর চিন্তায়।

এরপর প্রতিদিনই ও তরঙ্গিনীর ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখে। বিশেষ করে রাত্তিরে। আর কাউকে দেখতে পায় না। ব্যাপার কি? আর কি আসেনা সত্য? ও কথায় কথায় তরঙ্গিনীকেই সেদিন জিজ্ঞেস করে বসে,—দিদি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

—কি?

—তোর ঘরের সামনে সেদিন এমন ভয় পেলুম।

তেঁতুল আর লঙ্কা ডলতে ডলতে তরঙ্গিনী চোখ বড় বড় করে বলে,—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি দেখে ভয় পেলি? ভূত-টুত?

—না। মনে হোল একটা লোক আমার পাশ দিয়ে মানে—একবারে ইঁয়ে হয়ে গেল!

তরঙ্গিনীর গালদুটো রাঙা হয়ে ওঠে। চোখের কোলে নীলছায়ার ওপরে তারকা দুটো জ্বলে ওঠে চঞ্চলতায়। খিলখিল করে হেসে ওঠে,—ওমা, তাই নাকি? মানুষ কি রকম বলত?

—তা কি করে বলব? অমাবস্যার অন্ধকার।

—অ। তাই বল। ইঁদারার ওদিকে রাতবিরেতে আর যাসনি যেন। আমাদের সনকা ঝি ভূতচালা জানে। অমাবস্যায় ও আবার কি সব তন্তর মন্তর করে রাখে দুপুরে। নানা-রকম সব মূর্তি দেখা যায়। আবার দুপুর রাতে বাইরে বেরিয়ে কড়াই ভাজা-টাজা দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করে।

মৃগনয়নী ধাক্কা খায় যেন। তবে কি সনকা ঝির ভূতকেই সে দেখেছে? কিন্তু ভূত অত কথা বলবে কেন?

তরঙ্গিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। বলে,—ও সব ভূতগুলো আবার চেনাজানা মানুষের মত কথাবার্তাও বলে!

সর্বনাশ! তবে বোধহয় মৃগনয়নী ভূতই দেখেছে! জিজ্ঞেস করতে হবে সনকাঝিকে।

তরঙ্গিনী নিজেই যেন ভয় পেয়ে বলে,—আমি ত' ভয়ে সনকাকে একদিন বলেছিলুম আমার ঘর থেকে চলে যাও। সনকা আমায় একটা মন্তর শিখিয়ে দিলে, তারপর থেকে আমার আর ভয় হয় না। কিছু দেখিও না।

তেঁতুল মাখা একটু হাতে তুলে বলে,—দ্যাখত' আর লঙ্কা দোব নাকি? তোকে কিন্তু বেশী দোব না। কাঁচা পোয়াতি!

মৃগনয়নী হতভম্ব হয়ে গেছে। হাত পেতে তেঁতুল মাখা নেয়। মুখে দিতে ভুলে যায়।

—কি হোল রে? চেখে দ্যাখ?

একটু মুখে দেয়। ঝালটকে তেমন কোন স্বাদই পায় না। সমস্ত স্নায়ু ওর আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

—আর লঙ্কা ডলবো?

মাথা নাড়ে মৃগনয়নী।

—যাই বৌঠানকে আর পুঁটিকে ডাকি। তরঙ্গিনী বেরিয়ে যায়।

মৃগনয়নী অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকে। একটা কথা বলবার ক্ষমতাও ওর থাকে না।

কয়েকদিনের ভেতরই তরঙ্গিনী সম্বন্ধে ঘৃণাকে সংযত করে নিয়েছে মৃগনয়নী। ও ভেবে স্বস্তি পায় যে ও তাহলে ভুলই দেখেছে। ভাগ্যিস ভুল দেখেছে, নইলে দিদি তার কাছে কত ছোট হয়ে যেত। সনকা ঝিকে জিজ্ঞেস করেছিল। সনকা হেসে বলেছিল,—দিদি ঠিকই বলেছে। কাউকে যেন বোল না। স্বস্তি পেয়েছে মৃগনয়নী। একটা মাত্র অস্বস্তি বন-বিহারীর কোন খবর পাচ্ছে না আজ অনেক দিন। দুচারদিনের মধ্যেই আর একখানা চিঠি লেখে মৃগনয়নী। এবারে আরও অনুনয়। কিছুটা বা কড়া। কিছুতেই আর থাকিতে পারিতেছি না। খবর না একাএকাই কলিকাতায় যাইব। পত্রপাঠ উত্তর দিবা। আরও অনেক কথা।

তারপর আবার দিনের পর দিন উত্তরের প্রতীক্ষা। আরও মাস দুয়ে'র ওপর কেটে যায়। কর্তাবাবুর অবস্থা হঠাৎ যেন খারাপের দিকে যায়। দিনকতক হোল কিছুই খেতে পারেন না। খাওয়াতে গেলে চীৎকার করে ওঠেন। চুপ করে শুয়ে থাকেন। একভাবে। অবস্থা ভাল নয়। সমস্ত বাড়ীখানা আবার থম্‌থমে হয়ে ওঠে। সমস্ত গ্রামখানাও। কর্তাবাবুর অবস্থা খারাপ। কব্‌রেজ মশাই বলে গেছেন, বিশেষ আশা দেখাছিনে আর। যকৃতের কাজ কিছুই হচ্ছে না। হাতপায়ের পাতা ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কুকড়ে উঠছেন। কর্তামা পাশে বসে আছেন আজ প্রায় দুদিন। খাওয়া নাওয়া ভুলে গেছেন। শুধু ঠাকুর ঘরে এক আধবার যান। গিয়ে অজস্র কাঁদেন। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে শুনেছে মৃগনয়নী। ঠাকুরের সামনে বলছেন কর্তামা,—ওর এ যন্ত্রণা আর চোখে দেখতে পারাছিনা ঠাকুর। হয় ওকে নাও, না হয় সারিয়ে দাও। কুণ্ডিত গালদুটো ভেসে যায় চোখের জলে। মৃগনয়নী তাড়াতাড়ি সরে যায় ঠাকুর ঘরের সামনে থেকে।

আজ সন্ধ্যায় কর্তাবাবু চোখ মেলে তাকিয়েছেন। চারদিকে তাকাচ্ছেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন ঘোলা চোখে।

—কাউকে খুঁজছ?—কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন কর্তামা।

যেন হতাশ হয়ে চোখ বোঁজেন কর্তাবাবু।

—ডাকব কাউকে?

কর্তাবাবু আবার চোখ মেলেন। নিদারুণ কষ্ট হয় হয়ত তাকাতে। মৃগনয়নী সামনে ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন অন্য কাউকে দেখে।

—রাম! রাম কই?—এতক্ষণে অস্ফুটস্বরে বলেন কর্তাবাবু।

কর্তামা মৃগনয়নীর দিকে তাকান।

—বাবাকে ডাকব?—বলে মৃগনয়নী বাবাকে ডাকতে যায়।

ছোট ভাই রামতারণকে ডাকেন কর্তাবাবু। রামতারণ অতি অল্প সময় আসেন এ ঘরে। সর্বদাই আত্মস্থ। এক আধবার হয়ত খাবার পরে বা শোবার আগে ঘুরে যান। দেখে যান দাদা কেমন আছেন। রামতারণ ধীর পায়ে ঘরে ঢোকেন। পিছনে মৃগনয়নী। কর্তামা সরে বসেন।

কাছে আসেন রামতারণ,—দাদা ডাকছ? কি মৃদু শান্ত স্বর। কর্তাবাবু তাকান এবার। ইসারায় ডকেন,—কাছে আয়। রামতারণ ঠাণ্ডা অচঞ্চল হাতখানি রাখেন কর্তাবাবুর কপালের ওপর। জড়িয়ে ধরেন হাতখানা। বলেন আস্তে আস্তে,—রাম? রামতারণ তাকান। মৃদু হাসি মুখে। কর্তাবাবুর চোখদুটো ভিজে ওঠে, ঠোঁট দুটো কাঁপে,—রাম! হাতখানা ধরে বলেন,—আমার জন্যে একটু জপ করবি রাম? রামতারণ নীরবে তাকিয়ে থাকে। কর্তামা কেঁপে ওঠেন। মৃগনয়নীও। কর্তাবাবু চোখের কস্‌ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে বালিসে। বালিস ভিজে ওঠে। আবার চোখ বোঁজেন কর্তাবাবু। নিথর হয়ে পড়ে থাকেন কিছু সময়। নিজের হাতখানা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেন রামতারণ। ওঠেন। কর্তামা তাকান রামতারণের দিকে। ভয়ে ভয়ে।

রামতারণ হাসেন, ভয় নেই বৌঠান। দাদার কল্যাণে জপ আমি করব। কারো জন্যে করিনা। দাদার জন্যে করব।

কর্তামা আস্তে আস্তে গিয়ে বসেন কর্তাবাবুর কাছে। রামতারণ চলে গেলেন। নিজের ঘরে গিয়ে জপে বসলেন। বেশ মনে আছে মৃগনয়নীর মতবার বাবার কাছে গেছে ও, দেখেছে চোখ বুজে জপ করছেন বাবা। খেতে ডাকতে গিয়ে সাড়া পায় নি। বিছানা পেতে দিতে গিয়ে সাড়া পায় নি। সমস্ত রাত এক ভাবে বসে চোখ বুজে জপ করেছেন বাবা। ভোর রাত্রে কর্তা-

বাবু মারা যাবার পর রামতারণকে ডাকতে গিয়ে মৃগনয়নী অবাক। এইমাত্র জপ রেখে তাকালেন।

—বাবা, কর্তাবাবু—। মৃগনয়নী আর বলতে পারেনি।

পাদপূরণ করেছেন রামতারণ,—দেহত্যাগ করে গেছেন, দেখেছি।

'দেখেছি' কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল মৃগনয়নী। কিছু বলতে সাহস পায়নি চলে গেছে ওখান থেকে আর কথা না বলে।

কর্তাবাবুর মৃত্যুর পর সবাই ভাবল, এবার রামতারণকেই এ জমিদারীর হাল ধরতে হবে। কথাটা রটেও গেল চারদিকে। রামতারণ একটু হেসে ডাকলেন ছোটভাইকে। বললেন নায়েবকে, —ওইই সব দেখাশুনো করবে। যখন যা সই করবার দরকার হয়, করে দোব আমি। নায়েব মশাই আড়ালে একবার ছোটভাইয়ের নামে দুটো কথা বলতে এসেছিলেন,—মানে, বুঝলেন না, এতে কি কারো ভাল হবে? উনি একটু কুটবুদ্ধি!

—তা হোক। যা বলেছি, তাই করুন।

নায়েব চলে গেলেন অগত্যা। সব সংসারের ভার নিলেন খুড়োমশাই। খুড়ীমা নিশ্চিন্ত হয়ে মুখে দুটো পান পুরলেন। মা মনে মনে অজস্র দোষারোপ করলেন তার বরাতকে। এমন জপের জলা সার স্বামী যেন সাতজন্মের শত্রুরও না হয়! দেওরের হাতে সব ছেড়ে দেয়া, এটা কি ভাল কাজ হোল! খুড়োমশাই সংসারের কর্তৃত্ব কর্তামার ওপরেই রাখলেন। কর্তামা আপত্তি করেছিলেন,—আমাকে আর কেন ঠাকুরপো। খুড়োমশাই মুখখানা গম্ভীর করে বললেন,—তুমি ভেঙে পড়লে কি করে চলবে বৌঠান? কর্তামা আর কথা বলেননি।

সবচেয়ে ভেঙে পড়ল পুঁটিদি। কর্তাবাবুর মৃতদেহটা জড়িয়ে ধরে এমন কান্না বোধহয় আর কেউ কাঁদেনি। সবাই কর্তাবাবু বলে, তাই ছোটবেলা থেকে বাবাকে ও কর্তাবাবুই বলত। সেই থেকে পুঁটিদি'র ফিটের ব্যারাম হোল। মাঝে মাঝেই হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান হয়ে যেত। মুখে একটা অব্যক্ত শব্দ হোত। মৃগনয়নীর সামনেই কতদিন হোল, চোখে মুখে একটু জল দিলেই একটু পরে আবার স্থির হয়ে পড়ত। তরঙ্গিনী কারো সঙ্গে বেশী কথা বলা বন্ধ করে দিলে। বেশীর ভাগ সময়ই থাকত নিজের ঘরে। একা একা। কথা বললে বড় একটা উত্তর দিত না। কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব পেয়ে বসেছে যেন তাকে। একটা ঘটি মাজছে ত' মাজছেই। বার বার মাজছে।

মৃগনয়নী অবাক,—কিলো দিদি কবার মার্জাছস ঘটি?

—অ!—একটু যেন চমকে ওঠে তরঙ্গিনী। একটু লজ্জাও পায় মনে হয়।

দাওয়ায় বসে মাটি খুটতে খুটতে হয়ত বিকেলটাই কেটে গেল। সন্ধ্যার একটু আগে গা ধুতে যায়। গা ধুয়ে বাড়ী ফিরতে হয়ত বা সন্ধ্যে কাবার। মা বলেন,—গা ধুতে এত রাত হোল? কথা বলে না। ভিজে কাপড়খানি বুকের ওপর ভাল করে জড়িয়ে নিচের ঘরে ঢোকে তরঙ্গিনী। মা একটু বিরক্তই হন।

মৃগনয়নী হাঁপিয়ে ওঠে। শ্রাদ্ধাদির পরে যেন শূন্য হয়ে যায় বাড়ীখানা। যেন দেহ আছে প্রাণ নেই। সমস্ত প্রাসাদ নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। দেবতাহীন মন্দিরে যেন কতকগুলো বাদুড় ঝুলে আছে। নিজের নিজের একটু একটু প্রাণ নিয়ে ঝুলে আছে কোনমতে। নিজেকে সামলাতে এখন ব্যস্ত সবাই। বর্ষা চলে গেল। সড়কের পাশে খাল ডুবে গেল ঘোলা জলে। জল এবার উঠে এল বাইরের বিস্তীর্ণ আমবাগানে। জল থৈ থৈ আমবাগানে ঝির ঝির বর্ষণের শব্দ। টুপ্‌টাপ দু একটি জলে ভেজা পাতার শব্দ। আয়না মহলে উঠলে দেখা যায় যতদূর চোখ যায় শুধু জল। বটগাছটা দেখা যায় যেন ভাসছে জলের ওপর। ক্ষেত পুকুর ঝোঁপ

ঝড় সব একাকার। ছোট ছোট ডিঙি নিয়ে চলেছে বাজারে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জলে ভেজা বিরক্ত মানুষ। পশ্চিমপাড়ার ঘরের উঠোনে জল উঠেছে বন্যার মত।

কদিনই বা। দেখতে দেখতে জল কমতে সুরু হয়। ভেজা পিছল আমগাছের গুঁড়িগুলো দেখা যায় আবার। আমবাগান থেকে জল সরে যায়। জল গিয়ে থামে সড়কের মাথায়। গেরুয়া রঙের ঘোলা জলের রঙ ফিকে হয়ে আসে ক্রমে। আবার দেখা যায় সবুজ। ভিজে পচা গাঢ় সবুজে এধারে ওধারে। আরও দিন যায়। সড়ক থেকে জল নেমে এলো খালে। খাল টইটুম্বুর। জোরালো স্রোতে ডিঙিগুলো সামলানো দায়। টাল খেতে খেতে সিধে হয়। আয়নামহলের ছাদে দাঁড়ালে দেখা যায় গোছাগোছা কাশবন খেতের পাশে পাশে, বিলের ধারে ধারে দুলছে বাতাসে। একটানা বাতাসে তুলোর মত কাশফুল উড়ে যায়। উধাও হয়ে যায়। ঘোলাটে পাংশু আকাশে দেখা দিয়েছে সুনীল টুকরো টুকরো মেঘ। কিছু কিছু বা তুলোর মত নরম মেঘের টুকরো।

পুজো এসে গেল। ঢাকের বাজনার কথা মনে হলেই আজও বুকটা নেচে ওঠে মৃগনয়ণীর। সবচেয়ে ভাল লাগে সপ্তমীর দিন ভোরের ঠাণ্ডা শীতল বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা সানাইয়ের আওয়াজ। গায়ের সাড়াটা ভাল করে জড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। এমন এক অব্যক্ত অনুভূতি প্রাণে আসে যে কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় কি যেন অনেক নেই—অনেক অনেক নেই-য়ের ভেতর কি যেন এক আরামে বুক ভরে ওঠে। কিছুতেই উঠলো না মৃগনয়ণী।

তরঙ্গিণী এসে ডাকল,—কই'রে ওঠ।

উঁ! বলে আবার পাশ ফিরে শোয় মৃগনয়ণী।

পুঁটি ভোরে উঠে চলে গেছে শিবপুজোয়। ছেলের কাঁথাটা পালটে দিয়ে চলে যায় তরঙ্গিণী। ঘাটের দিকেই যায়। ভোরে স্নান করে আসতে হবে। কর্তামার সঙ্গে পুজোর কাজে বসতে হবে। নাড়ু, খইমুড়কী মোয়া, তক্তি এমন গণ্ডাজলী পর্যন্ত করে দিতে হয়েছে। একমাস আগে থেকে খাটতে সুরু করেছে তরঙ্গিণী। রোজ দুপুরে ভোগের রান্না যার। তরঙ্গিণীর কাজ বড় পরিষ্কার। কর্তামা তাই ওর ওপরই বেশী কাজ চাপান। পুঁটিকে একটু কাজ করতে বললে ঘেমে অস্থির হয়ে ওঠে। ওকে দিয়ে ফুলের সাজ, থালা সাজান এ ছাড়া আর কিই বা হতে পারে! কর্তামা মানুষ বুঝে কাজ দেন। তাঁর বিচক্ষণতার তুলনা দেখতে পাননি আর মৃগনয়ণী। এবার কর্তামা একটু বিমর্ষ। কর্তাবাবু নেই। তাছাড়া খুড়োমশাই টাকার দিকটা একটু চেপেছেন এবার।

তেমন আদায় পত্তর হোল না বোঠান। মহলে গিয়ে অবস্থা দেখে চক্ষুস্থির। কর্তামা চুপ করে থাকেন।

খুড়োমশাই নিজে নিজেই হাসেন,—একটু টেনেটুনে কি করা যায় না?

তা কেন যাবে না?—কর্তামার মুখখানা শুকিয়ে গেলেও বলতে হয়।

তা নয়, মানে, ধরো ডালের সাজ না করে এবার না হয় মাটির সাজ হোক।

কর্তামা দৃঢ় স্বরে আস্তে বলেন,—না। ডালের সাজ হবে। যেখানে কমাবার আমি কমাব।

খুড়োমশাই হাসতে হাসতে চলে যান,—বাঁচলুম, যা হয় তুমি করো।

কর্তামা চুপ করে বসে ভাবেন।

কমাতে হয় কর্তামাকে। ভোগের দিকটা। অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছু হয় না। কিন্তু আয়োজন একটু কমাতে হয়। নিমন্ত্রণের দিকে টানাটানি না করলে আর চলে না এবার।

বাড়ীর সবাই বোঝে। বলে না কেউ কিছু। কর্তামার মুখের ওপর কিছু বলা—ভাবতেও পারা যায় না।

পুজোর ভেতরে এবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ভাবতে পারা গেল। অতি সামান্য কারণে খুড়োমশাই এমন চীৎকার করে উঠলেন যে সবাই শুধু ভয়ই পেলো না? রীতিমত কাঁপতে লাগল। এও কি সম্ভব? বাইরের মানুষও কিছু ছিল। বাড়ীতে যে কত মানুষ ছিল আঙুলে গোণার বাইরে। এত মানুষের সামনে খুড়োমশাই প্রায় চীৎকার করে উঠলেন,—আমার কথার ওপর কথা। দুপুরে লোক খাবে না। আমি বলেছি, সব লোক খাবে সন্ধ্যে থেকে। তাই হবে। তাই হতে হবে। কে বলেছে দুপুরে লোক বসাতে? কে একজন প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল,—আজ্ঞে কর্তামা।

কর্তামা-টর্তামা বুঝি না। আমি যা বলব, তাই হবে।

কর্তামা মণ্ডপের দোরের পাশে দাঁড়িয়ে চৌকাঠটি ধরলেন। চোখ দুটো বুজলেন একবার। একটা পাথরের মত নীরেট বহুপুরোনো বাঁধ ভেঙে গেল যেন। এই আজ ভাঙল। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সবাই দেখল। চোখের সামনে দেখল এই ভাঙনের সুরু। স্তব্ধ হয়ে গেল। হতবাক হয়ে গেল। এইবার ভেঙেছে। একটু বা উল্লসিতও হোল কেউ কেউ। এতকালের এক দম্ভ চূর্ণ হোল আজ। খুড়োমশাই খড়মের শব্দ করতে করতে চলে গেলেন। কর্তামা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোয়ালদুটো কঠিন হয়ে আরও চেপে গেল যেন। সাদা সাদা চোখদুটো কর্তামার মৃতের মত মনে হোল।

পুজো কাটল। বিষণ্ণ এক মেঘ এসে ঢাকল যেন শরতের আকাশ। প্রাসাদের কোণে যে বটগাছটার চারা বারবার কেটে দিয়েছিলেন কর্তাবাবু, সেটা এবার আর কারো নজরে পড়ল না। ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে বাড়তে লাগল। বিশীর্ণ মুখে কর্তামা আরও নীরব হয়ে গেলেন এই বাড়ীটার মতই। শীর্ণ শরীরে তাঁর ঝরে পড়ল মেদ। পলাস গাছের পাতাগুলো সব ঝরে পড়ল। শীত এলো। এবারে যেন প্রচণ্ড শীত। বটগাছের মাথায় সূর্য ওঠবার আগে পর্যন্ত কুয়াশায় ঢেকে থাকে চারদিক। ভিজে ওঠে ঘাসের ডগা, গাছের পাতা আর ক্ষেতে মটর লতার পাতাগুলো। সন্ধ্যার আগেই ঘরের দরজাগুলো ভেজাতে হয়। আলোগুলো যত উজ্জ্বলই হোক কুয়াশার ভেতর মিটমিট্ করে। এখানে ওখানে তাওয়ার ভেতরে তুষের আগুনের সামনে বসে ঝিমোয় বুড়োবুড়ীরা। কর্তামার ঘরেও এক তুষের তাওয়া। আর একটি তাওয়া মৃগনয়ণীর কাছে। ওর ছেলের জন্যে। মৃগনয়ণীও ঝিমোয়। ঘুমের সুখ নেই আর। ছেলেটা বড় কাঁদুনে। রাত্রে ঘুমোবার জো নেই। না ঘুমোলেই নানা চিন্তা। বনবিহারী যে কেন চিঠি দেয় না। কেন আসে না? কতদিন খবর নেই তাঁর। তাঁর শীতের বিশীর্ণতার ভেতরেও তরঙ্গিণী—যেন আরও উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। শীতের নীরসতার ভেতরেও রসাল হয়ে ওঠে ওর শরীর। নিতম্বের গুরুভারে গম্ভীর হয়ে ওঠে চলা। রঙ যেন ফেটে পড়ছে আরও। চোখে এক সলজ্জ শান্ত ভ্রমর বাসা করেছে বুঝি অবাক হয় মৃগনয়ণী।

(ক্রমশঃ)

আ লো চ না

স্বদেশের কুকুর ধরিব

নিজের দেশকে সব মানুষই ভালবাসে যেমন ভালবাসে নিজের আপনার জনকে। সে ভালবাসা স্বভাবের অঙ্গ। এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে দেশকে যারা ভালবাসে তারা সবাই নিঃস্বার্থ। নিজের ছেলেমেয়ের প্রতি ভালবাসাটাও আত্মজ্ঞানশূন্য নয়। সেখানে আমার ছেলে আমার মেয়ে, ঝোঁকটা পড়ে ঐ 'আমার' উপরে। সে ভালবাসা সম্বন্ধশূণ্য নয়। এতে অপরাধের কিছু নেই। নিজের ছেলেমেয়ে ভাইবোন প্রভৃতির প্রতি যদি একটা বিশেষ পক্ষপাত না থাকে তাহলে সংসারে সবাইকে নির্বিকার ব্রহ্ম হতে হয়। তেমনি নিজের দেশের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ থাকবে, তার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তার কোলের উপর টান থাকবে এটা না হওয়াই স্বভাবের ব্যতিক্রম।

কিন্তু আরও দশটা সৎকর্মের মতো এরও একটা সীমা থাকা চাই। সংসারের আর সব কাজের সঙ্গে আমাদের মানসিক অনুভূতির যখন সামঞ্জস্য ঘটেনা তখনই তা মস্তিষ্কবিকৃতির পর্যায় গিয়ে পড়ে। ভালবাসায় অধীর হয়ে বলা যেতে পারে 'আমি ভালবাসি যারে সে কি কভু আমা ছেড়ে দূরে যেতে পারে'—কিন্তু সেই বলাটাকেই যদি চরম বলে মেনে নিয়ে কাজে ফলাতে যাই তাহলে আমার প্রতি সংসারের নির্বিকার ঔদাসীন্য দেখে দেয়ালে মাথা ঠোকা ছাড়া উপায় নেই। প্রমত্ত-স্নেহ বাপ নিজের ছেলেটিকে গোপাল প্রমাণ করতে গিয়ে অন্যের ছেলেকে মেরে পাগল করে যদি, তাহ'লে নিজের ছেলের প্রতি যেমন দরদের পরিচয় দেওয়া হলো না তেমনি অন্যের ছেলেকে শাসন করার মধ্যে যে চেহারা দেখা গেল সেটা মনুষ্যোচিত নয়।

ব্যক্তির আচরণের এই বিকার বৃহত্তর আকার ধারণ করে যদি ক্ষেত্র বড় হয়। একটা মিথ্যাকে বারে বারে আওড়ালে সেটা মনের মধ্যে একটা নেশার সৃষ্টি করে। যে পানীয় অল্প-মাত্রায় স্বাস্থ্যরক্ষার কারণ হয়—মাত্রাধিক্যে তাই মৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ে। সুতরাং আমার দেশের সব ভাল এই কথাটা বার বার বলতে বলতে মানুষ বিশ্বাস করতে সুরু করে যে সত্যি সত্যিই আমার দেশের সব ভাল। সেইনেশার ঝোঁকে এই সহজ সত্যটা ভুলে বসতে হয় যে ভালমন্দের দুইপায়ের ওপর সংসারটা ভর করে আছে। তখন দেশের অন্যায়গুলো মাথায় নিয়ে মত্ততার ব্যভিচার সুরু হয়।

এ কথা শিশুতেও জানে যে কারণ ছাড়া কার্য নেই। দেশকে ভালবাসার যেমন সংগত কারণ আছে, দেশকে নিয়ে উদ্ভট পাগলামীরও একটা কারণ অবশ্যই আছে। সে কারণটা কি? বর্ণের বেড়া তুলে মানুষকে সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, ব্রাহ্মণ্যগুণ্ডামীর হাতে মানুষের ধর্মবোধকে লাঞ্ছিত হতে দেওয়া, সব রকম সামাজিক অধিকার থেকে মেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখার মতো অপকর্মগুলো মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেন মেনে নিচ্ছে। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকে পঙ্গু করতে না পারলে, বিশ্লেষণী বৃত্তিগুলোয় মরচে না ধরাতে পারলে, লোভীর ক্ষমতা কায়েমী হয় না। সেই কারণে শাস্ত্রপাঠে ব্রাহ্মণের অধিকার কায়েমী ছিল—শূদ্রের নয়। কিন্তু শুধু নেতিবাচক পদ্ধতির

আত্মরক্ষা বেশীদিন চললো না। তাই বলা হলো রাজাকে সেবা করাই প্রজার ধর্ম। সেও বেশী-দিন চললো না। সভ্যতার চেহারা বদলালো—রাজতন্ত্র পথ ছাড়লো বণিকতন্ত্রের কাছে। তখনই বণিকতন্ত্রকে নতুন বস্তুর সন্ধান করতে হলো যা দিয়ে খুসী রাখা যায় জনতাকে। বণিকতন্ত্রের হয়ে সেই বশীকরণ মন্ত্র যোগালেন অল্পবুদ্ধি কবি। নেশায় মেতে ওঠবার ওষুধ ধরিয়ে দিলেন—"স্বদেশের কুকুর ধরিব বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" তারপর সেই নামের উচ্ছল বিগলিত ভক্তিস্রোত আজ বহুদিন ধরে জীবনের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আবিল করেছে। বিকৃত অহংকৃত দেশাত্মাভিমানকে দেশাত্মবোধের মুখোস পরাবার চেষ্টা করেছে।

মানুষের সভ্যতার একটা বিশেষযুগে এই বিকৃত দেশাত্মবোধের প্রবল ঘোষণা বিশেষ গৌরবের সঙ্গেই যেন ঘোষিত হলো। হিটলারতন্ত্র সেই দেশাত্মবোধের কঠিন ভিত্তির উপর সমস্ত জার্মান জাতিকে দাঁড় করালো এবং জার্মান জাতিই-আর্য জাতি এই নেশায় মাতাল করে সমস্ত জাতিকে নানা অমানুষিক বর্বরতার কাজ করালো অবহেলে। আজকের আমেরিকায় এই জাতীয়তার খেলা চলছে গণতন্ত্রের সমস্ত ঘোষণাকে ছাপিয়ে। 'আন্ আমেরিকান' হওয়ার অপরাধ কারুর উপর চাপালে সারা জাতির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। ওদিকে সোসালিজমের মুখোস পরা সোভিয়েট নানা উপায়ে রাশিয়ার পুরানো ইতিহাস উল্টে ভৌগোলিক দেশাত্ম-বোধকে জনতার বিশ্বাসভাজন হবার হাতিয়ার করে তুলছে। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে আজকের মানুষের মনের ক্ষেত্রেও এই ভৌগোলিক সীমার অনুরূপ কয়েকটা আল তৈরী হয়ে গেছে। মানুষে মানুষে মনের আদান প্রদান হচ্ছে না সহজে। একদেশ থেকে অন্য দেশে মাল যাচ্ছে, পণ্য যাচ্ছে, সাগর পেরিয়ে, পর্বত লঙ্ঘন করে—কিন্তু দুটি ভিন্ন দেশের মানুষের মনের মিল যাতে না ঘটে তারই জন্যে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের কত চেষ্টা—নানা সঙ্কীর্ণসীমায় তার মনের পরস্পরাভিমুখী গতি অবরুদ্ধ।

আমাদের বাংলা দেশে মনের বেড়া ভেঙেছিলেন রামমোহন। নানা জাতের শিক্ষা, নানা ভাষা, নানা মানুষের মন তার মনের সমুদ্রে এসে মিলেছিল। ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসেন নি এ কথা কে বলবে কিন্তু অন্যদেশের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন কেমন করে বিচলিত হতো তা তাঁর জীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন। সমস্ত পৃথিবীকে যাঁরা প্রতিবেশী করে নিতে পারেন তাঁরাই সকল মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে পারেন। তাই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ভারতবর্ষে চালু হোক একথা তিনি বলতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বস্ব গেল বলে একদল লোক সমস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলেন। তারা সহমরণ রোধ করার সময়ও রামমোহনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। যেটা গতানুগতিক, যেটা আমাদের বহুদিনকার অভ্যাস, যেটা মজ্জাগত সেটার প্রতি মানুষের একটা বিশেষ আসক্তি আছে। সেই প্রত্যহকার গণ্ডীর বাইরে কোন একটা অজানা কথা, কোন একটা নতুন বিষয়ের উত্থান করলেই একদল লোকের গতানুগতিক শান্তিতে বাধা পড়ে। রামমোহনের বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল, তাই তাঁরা প্রথমেই যে কথা বললেন তার মূল অর্থটা হলো রামমোহন দেশদ্রোহী, বিদেশী ধর্ম, বিদেশী চিন্তা, বিদেশী আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁর আসক্তি। তাঁর সম্বন্ধে ছড়া গেয়ে বলা হলো "বেটা জেতের দফা করলে রফা মজালে তিনকুল।" তবু আজ আমরা সবাই জানি দেশকে ভালবাসতেন বলেই দেশের যা বীভৎস, যা নোংরা তাকে নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি তিনি করেন নি। তাঁর চোখের সামনে আরও অনেক বড় বড় কাজের ছবি ছিল বলেই দেশের সত্যরূপটিকেই নানা মোহ থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর

বিরুদ্ধবাদীদের সে কল্পনার শক্তি ছিলনা তাই সিন্ধু পারে কোন দেশে বিপ্লব ঘটলে আনন্দ করার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে তা তাঁরা বুঝতেন না।

দেশাত্মাভিমানকে বড় করে তোলার একটা কারণ সহজবোধ্য। ভাবটাঅনেকটা এই যে আমার নিজের কথা তো বড় হচ্ছে না, বড় হচ্ছে দেশ। আমার দেশ যে বড়ো এই কথাই তো বলতে চাই তাতে অপরাধটা কোথায়। এর উত্তরও সহজ কিন্তু দেশ-দেখা চোখ যারা হারিয়েছে তারা যে গবাক্ষ-লণ্ঠনের মত একদিক দিয়ে দেখবে এতো সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। নিজের দেশকে বড় বলতে গিয়ে যখন অন্য দেশের ভালটাকে মন্দ বলতে হয় তখনই বোঝা যায় যে আমার দেশের 'আমার'-টাই বড়ো দেশ বড়ো নয়। মনুষ্যত্ব বস্তুটাকে অখণ্ড মূর্তিতে দেখতে, কোন স্থান কালের বেড়ার বাঁধনে না বেঁধে তাকে বিচার করতে যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও উদার্যের প্রয়োজন তা গুপ্তকবির ছিলনা। কিন্তু পরবর্তীকালে এমন অনেক সুশিক্ষিত অভিমানীদের দর্শন মিলেছে যাঁরা নিজেদের জীবন-জোড়া ভারতীয়তার বা বাঙ্গালীপনায় গদগদ। আজ ইংরাজী-ভাষাকে হিন্দীর দ্বারা স্থানচ্যুত করার যে যড়যন্ত্র চলেছে তার প্রধান যুক্তির সম্বল হচ্ছে—ইংরাজি বিদেশী হিন্দী দেশী। ভৌগলিক অপদেবতা হিন্দীওয়ালাদের সহায় হয়েছেন। ইতিহাসের পরিহাসপ্রিয়তায় ইংরাজীভাষাই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিল—তার চেয়ে বড় কথা যে চাবি দিয়ে বিশ্বের ভাণ্ডারে আমাদের প্রবেশপথ সুগম হয়েছে আজ তারই উপর একটা অন্ধ ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছে।

বহির্বিশ্বের ভালমন্দের প্রতি উদাসীন থেকে দেশীয় উন্নতির কামনা শুধু ধারণা হিসাবে ভ্রান্ত নয়, জীবন দর্শন হিসাবে সংকীর্ণও বটে। আমি এমন লোককে জানি যিনি নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশের ভাল লোকদের যথেষ্ট ভাল বলে স্বীকার করেন না। মানুষ আত্মবিশ্বাসে কত মহৎ হতে পারে সে ব্যাপারে সক্রেটিসের উদাহরণ দেওয়া মাত্র চটে উঠে বল্লেন—কেন বিলিতি লোক কেন, আমাদের দেশে কি তেমন লোক নেই। যাঁদের মহাপুরুষ বলি তাঁদের জাত নেই এই কথাটা এই সব ছিচকাঁদুনে দেশপ্রেমিকদের কে বোঝায়। দেশ তাদের দেবতা আর ভালমন্দ যা ঘটে সবই দৈব। দেশীয় প্রথার অজুহাতে তারা বর্ণাশ্রম সমর্থন করেছে, পণপ্রথার যৌক্তিকতা খুঁজছে আর তর্কে কোণঠাসা হলে নির্বোধের ভাণ করে বলছে লেখাপড়া বেশী জানিনে বাপঠাকুর্দা যা করে আসছেন তাই কর্চ্ছি।

পিতৃপুরুষে যা করে গেছেন তার সবটাই যদি ভাল হতো বা সকল যুগের উপযোগী হতো তা হলে মানুষের সৃষ্টি-সীমায় পেঁছে গেছে এ কথাটাই মানতে হয়। তা যখন মানতে কেউ রাজী নন তখন পিতৃপিতামহের সমাজ ব্যবস্থায় আচারে কিছু উন্নতি ঘটানোর অবকাশ আছে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। পৃথিবীর সব সত্য আমাদের বেদ বেদান্তের ঋষিরা বলে গেছেন এই ধরণের কচিখোকাসুলভ গোঁড়ামী আমাদের অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরও আছে।

আজকের ছেলেমেয়েদের এ সম্বন্ধে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর মানুষ তার বুদ্ধি আর বোধের ভেলায় চড়ে ভৌগলিক সীমার সগার পেরিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে নানা ধরণের পণ্যের আদানপ্রদান প্রতিদিন হবে কিন্তু অন্য দেশের চিন্তা যাচাই করতে বললেই স্বদেশের কুকুর আর বিদেশের ঠাকুরের প্রশ্ন ওঠে। ভারতবর্ষ একদিন সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সত্যের যোগে বাঁধা পড়বে এই স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথকে এদেশের শিক্ষিত-শ্রেণীর এক সম্প্রদায় অল্প আঘাত করে নি। আজ দৃষ্টিকে বহির্মুখী করার সময় এসেছে। ভারত সরকার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় বাঁধ কলকারখানার স্বপ্ন তুলে ধরেছেন।

গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলবে কিন্তু মানুষের গ্রাম্য মনের সংকীর্ণ দেশাত্মাভিমানের স্তিমিত প্রদীপকে স্থানচ্যুত করার কি ব্যবস্থা হলো। সেই দেশাচারের শাসন, সেই অন্ধ জাত্যাভিমান ঘুচলো না। ভারতের মানচিত্র হয়তো আর দশটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বদলে যাবে কিন্তু মনের মানচিত্রে কোন ছাপই কি পড়বে না?

সোমেন বসু

পূর্বাঞ্চলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকা প্রসঙ্গে

পৌষের "সমকালীন"-এ প্রকাশিত "পূর্বাঞ্চলে বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকা" প্রবন্ধটির নামকরণ ঠিক হয় নি মনে হয়, যদিও প্রবন্ধটি সুলিখিত ও তথ্যবহুল। প্রবন্ধটির নাম "পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারের পটভূমিকা" হওয়া উচিত ছিল। কুচবিহার, আহোম, জয়ন্তীয়া, মনিপুর ও ত্রিপুরার অনার্য রাজবংশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে এসে পড়েন ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন—এটা সত্য কথা, কিন্তু "রাজবংশগুলি হিন্দু-ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে নতুন নতুন সংস্কৃত নাম গ্রহণ করতে লাগলো, তারপর ধীরে ধীরে বাংলায় কাব্যরচনা ও শাস্ত্ররচনা হতে লাগলো রাজাদেশে," এটা একমাত্র ত্রিপুরার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আহোম রাজগণ অসমীয়া ভাষার (আসামী নহে) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কুচবিহার অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যের যা কিছু নিদর্শন আছে সে সবই অসমীয়া ভাষায়—বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা এগুলি বাঙ্গালা রচনা বলে দাবী করেন নি। জয়ন্তীয়া ও মনিপুর রাজ্য থেকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন নিদর্শন মিলেছে বলেও আমাদের জানা নেই। লেখকের জানা থাকলে তা পাঠকদেরও জানানো প্রয়োজন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বিলাসিতা প্রসঙ্গে

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন যে দেশের জীবনযাত্রার মনের সামগ্রিক অধোগতি সত্ত্বেও বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে আমাদের বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের অন্যতম কারণ হচ্ছে বিদেশী বিলাসদ্রব্য এবং উপভোগ্য পণ্য আমদানীর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। নতুন আমদানী নীতিতে এ বিপদ এড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে সন্দেহ নেই, তবু এই প্রবণতা যে কতখানি বেড়ে গেছে এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উন্নয়নের সময়ে অত্যাবশ্যক বিদেশী যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি আমদানীর কাজেই অনুন্নত দেশের সামান্য বৈদেশিক সম্পদ নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেদিক থেকে বিলাসসামগ্রী ক্রয়ের জন্য জাতীয় সম্পদের অপব্যয় রীতিমত নৈতিক অপরাধ। কিন্তু বলা যেতে পারে যে বিদেশী সামগ্রী না কিনেও দেশজ বিলাসদ্রব্য ব্যবহার দ্বারা আমাদের আকাঙ্খা মেটান সম্ভব। এবং সেক্ষেত্রে বিলাসিতা অমার্জ্জনীয় নয়।

কিন্তু বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের প্রশ্ন আমাদের দেশে শুধুমাত্র স্বদেশী বা বিদেশী পণ্যের প্রশ্ন নয়। এর যৌক্তিকতা বিচার করতে গেলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক মনস্তত্ত্বে বিলাসিতার প্রভাব অনুসন্ধান করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে বিলাসিতা সম্বন্ধে আমাদের মনে এক অদ্ভুতধরণের পরস্পর বিরোধিতার অস্তিত্ব আছে। এদেশে এক সময়ে নানাকারণে সরলজীবনযাত্রা ও উচ্চচিন্তার আদর্শ শ্রদ্ধেয় ছিল। পরাধীনতার যুগে আড়ম্বরপূর্ণ বিদেশী জীবনযাত্রার প্রভাব ও আমাদের নিজেদের হীনমন্যতা সেই আদর্শে আমাদের আস্থা শিথিল করলেও, তার আভাস এখনও আমাদের মনে কিছু পরিমাণে সক্রিয়। আবার অন্যপক্ষে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের সামাজিক আর্থিক সঙ্কট আমাদের জীবনে যে গভীর হতাশা ও নৈতিক মূল্যমানের অবক্ষয় সূচিত করেছে, তার প্রভাবে আমাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সহজ ও সুন্দর পদ্ধতিগুলির পরিবর্ত্তে আমরা নানা বক্রপথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। মানসিক জগতে যে সমস্যাগুলি উদ্ভাসিকতার জন্মদাতা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এবং পণ্যব্যবহার প্রথায় তা-ই বিলাসসামগ্রীর অত্যধিক ব্যবহারের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই ক্রমবর্ধমান বিলাসিতা কিছু পরিমানে আমাদের সমাজে ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার, পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় এবং ব্যক্তিগত জীবনের স্বস্তিহীনতা ও হতাশার যৌথ ফলস্বরূপ। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের বৈশিষ্ট্যের সর্ব্বোচ্চ স্বীকৃতি তার সম্পদের পরিমানে। ব্যাঙ্কব্যালান্স যখন সদাসর্ব্বদা সকলকে জানাবার উপায় নেই, তখন নিজের সম্বন্ধে অন্যের মনে সম্ভ্রমসৃষ্টির অন্যতম সহজ উপায় বহুমূল্য বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের সাহায্যে মূক কিন্তু সক্রিয় বিজ্ঞাপন দান। যে কোন ধনতান্ত্রিক সমাজেই তাই বৈশিষ্ট্য-সূচক উপভোগ (conspicuous consumption) এক বিশেষ লক্ষ্যণীয় প্রথা। কিন্তু পৃথিবীর যে সব দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ অপেক্ষাকৃত সুস্থ আবহাওয়ায় সম্ভব হয়েছে, এবং যেখানে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে দুর্দ্দশা, হতাশা ও ক্ষোভ এমন সর্ব্বব্যাপী নয় বলে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপ্রকাশের

অন্যান্য সুন্দরতর পদ্ধতিগুলি ও (সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজসেবা, স্বীয় কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন ইত্যাদি) সমাজের গরিষ্ঠতম অংশের পক্ষে অনায়ত্ত নয়, সেসব জায়গাতে বিলাসিতা প্রবৃত্তি এমন সহসা উৎকট হয়ে দেখা দেয় নি এবং দরিদ্র দেশে বিলাসিতার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী দুর্নীতিও এমন বিপুলায়তন ধারণ করে নি। এছাড়া যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বিদেশীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগও সঙ্গত কারণেই লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। ইউরোপ, আমেরিকার জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু তা' অনুকরণ করার আকাঙ্ক্ষাও বিশেষভাবে বেড়েছে।

ক্রমবর্ধমান বিলাসিতার কারণগুলি মোটামুটি দেখা গেল। সুতরাং আমাদের দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রবণতা কতদূর বাঞ্ছনীয় এবার সে প্রশ্নে আসা চলে।

বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের সমর্থকরা এই প্রসঙ্গে বিশেষপাঠ্য অর্থনীতি পুস্তকের এক পঙ্‌ক্তি যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। তাঁদের মতে বিলাসদ্রব্য ব্যবহার কমে গেলে বিলাসদ্রব্যশিল্পে নিযুক্ত লোকেরা কর্ম্মহীন হয়ে পড়বে, ফলে দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। অন্যপক্ষে বিলাসিতার প্রসার বিলাসদ্রব্যশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি তথা লোকনিয়োগের ক্ষমতা বাড়াবে। এ জাতীয় যুক্তি অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব এবং অনুন্নত দেশের আর্থিক কাঠামো সম্বন্ধে হাস্যকর অজ্ঞতাই প্রকট করে। অনুন্নত দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে উৎপাদনের কতগুলি অত্যাবশ্যক উপকরণের (বিশেষতঃ মূলধন, সংগঠন নৈপুণ্য এবং দক্ষ শ্রমিকের) অভাব না থাকলে বিলাসদ্রব্য শিল্পের অস্তিত্ব তথা প্রসার এই যুক্তিতে সমর্থন করা চলে। কিন্তু যে দেশে বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক শিল্পগুলি এখনও ভালভাবে গড়ে ওঠে নি, এবং যেখানে জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক বা কর্মদক্ষতা বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক পণ্যগুলির গুরুতর অভাব বর্তমান, সেখানে বিলাসদ্রব্যশিল্প নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। বিলাসদ্রব্যগুলি উৎপাদনের জন্য যে অত্যাবশ্যক উপকরণগুলি ব্যবহার করে তার অনেকগুলি দেশগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প-গুলির জন্যও আবশ্যক। বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে গেলে, বিলাসদ্রব্যশিল্পের মুনাফা এবং বিনিয়োগশক্তি এত বেড়ে যাবে যে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিকে বঞ্চিত করেও উৎপাদনের দুষ্প্রাপ্য উপকরণগুলি বাজার থেকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তার হবে। ফলে অপ্রয়োজনীয় শিল্প বাড়বে, কিন্তু প্রয়োজনীয় শিল্পের অভাবে জাতীয় অর্থনীতির প্রগতি গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

এ ছাড়া সঞ্চয়প্রবণতার ওপরেও বিলাসিতার প্রভাব অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিখ্যাত অর্থনীতি-বিদ্ ডুসেনবেরি তার Income, Savings and the theory of consumer Behaviour বইয়ে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন ব্যক্তির উপভোগপ্রবণতা বহুলাংশে পরস্পর নির্ভরশীল। উচ্চতর স্তরের উপভোগের প্রকৃতির প্রভাব এবং উন্নততর উপভোগসামগ্রীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নীচেরস্তরের লোকের উপভোগপ্রবণতা বাড়িয়ে তোলে। এই demonstration effect এর ফলেই সম্পদশালী লোকের বিলাসিতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দরিদ্রতর লোকেদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়; ফলে সঞ্চয় ক্ষমতা শুধু যে কমেই যায় তাই নয়, নিজস্ব আয়ের গণ্ডীতে বর্দ্ধমান ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি সম্ভব না হওয়ার জন্য মনে যে অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি হয়, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তোলে।

দেশকে গড়ে তুলতে হলে তাই বিলাসিতার এই স্রোতকে রুদ্ধ করতেই হবে। শুধু যে যাদের নেই, তাদের পক্ষেই সরল জীবনযাত্রা বাঞ্ছনীয় তাই নয়,—যাদের প্রচুর আছে, তাদের পক্ষেও বিলাসিতা সামাজিক অপরাধ। সমাজমানসে এই বোধ জাগিয়ে তুলতে না পারলে জাতীয় প্রগতি অসম্ভব।

সুব্রতেশ ঘোষ